Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সম্মান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না ফারহানা চৌধুরী

রোলঃ 228020921

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সন্মান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না ফারহানা চৌধুরী

রোলঃ 228020921

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সন্মান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রত্না ফারহানা চৌধুরী, আইডিঃ 228020921 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সন্মান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

রত্না ফারহানা চৌধুরী

আইডিঃ 228020921

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

وَالسّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِيۡنَ وَالۡاَنۡصَارِ وَالَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ وَاَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡـفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।

[সূরাঃ আত-তাওবা , আয়াত ১০০]

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে।

[-সূরাঃ আল-ফাতহ, আয়াত ২৯]

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

"নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও হিদায়াত প্রার্থনা করি আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ তা'আলা যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর যাকে পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।"

কুরআন ও সুন্নাহ এ সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতে সাহাবীদের মর্যাদা অধিক উচ্চতর স্থানে উন্নীত হয়েছে। সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে বিভিন্ন স্তরভেদ থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মের কোন মুসলমানই, একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা একমত। এই সাহাবীরাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্য সূত্র, প্রথম বন্ধন। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখা, আল্লাহর রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সব কিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূল ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

হাফেজ ইবনে আবদিল বার সাহাবীদের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এর সুহবত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাজত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা এই সব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণের তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' ও 'খায়রু উম্মতিন' এর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

প্রানপ্রিয় রসূল সা. বলেছেন: 'আমার সাথিরা উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ।' আর এ মানুষগুলোর প্রতি আল্লাহ পাক যে রাজি হয়ে গেছেন, সে কথা পবিত্র কুরআনেই ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ কোরআনে এরশাদ করেছেন–

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লহ তায়া'লা ঐ সকল মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (যাহারা আপনার সফর সঙ্গী), যখন তাঁহারা আপনার সাথে গাছের নিচে অঙ্গীকার করছিলো এবং তাঁদের অন্তরে যা কিছু (ইখলাস ও মজবুতি) ছিল তাও আল্লহ তায়া'লার জানা ছিল, আর আল্লহ তায়া'লা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (এর দ্বারা খায়বরের বিজয় কে বুঝানো হয়েছে, যা একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করলেন। (সূরা ফাতহঃ ১৮*)*

তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান ও দীনের যথার্থ জ্ঞানে, নিষ্ঠা ও অবিচল বিশ্বাসে, এবং দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং আমলের পরিপূর্ণতায় সর্বোচ্চ কুরবানি প্রদানে আর সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসায়, অনুগ্রহ, আত্মত্যাগ, দয়া, ও কল্যাণ কামনায়, কঠোর সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সংঘবদ্ধতায় আর চিন্তার ঐক্য ও সৎ কাজের প্রতিযোগিতায় তাঁরা ছিলেন এক সুউচ্চ আলোর মিনারের মতো। আর সে আলো ছিলো কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রসূলের পরিপূর্ণ রূপায়ণ।

সাহাবা কারা ?

(الصحابة) শব্দটি (صاحب) এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ বাক্যটি ব্যতীত (فاعل) এর বহুবচন (فعالة) অন্য কোনো শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

[লিসানুল আরব, (৪/২৪০০); আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস ওয়াল আসার, (৩/১২); তাজুল 'আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস, (৩/১৮৬)। সাহাবী শব্দটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়; এমনকি তাদের নাম হিসেবেই শব্দটির ব্যবহার। এ কারণেই সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করা হয়। আল-কুল্লিয়্যাত, কাফাভী, পৃষ্ঠা ৫৫৮]

শর'ঈ পরিভাষায় সাহাবী বলা হয়, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং ইসলামের ওপর মারা গেছেন।
[আল-ইসাবা ফি তাময়ীযেস সাহাবাহ, ১/১৬]

এটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। অতএব, সাহাবী সাব্যস্ত হতে এর চেয়ে আর বেশি শর্তাবলী আরোপ করার প্রয়োজন নেই। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দীর্ঘ সাহচর্য, তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা ইত্যাদি।

ইবন কাসীর রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন তিনিই সাহাবী; যদিও তার দীর্ঘ সাহচর্য নেই বা তাঁর থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।' এটি সৎপূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সব আলেমের অভিমত।
[ইখতিসারু 'উলুমিল হাদীস মা' আল-বা'ইস আল-হাসীস, ১/৪৯১]

ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, 'যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে একবছর বা একমাস বা একদিন বা এক ঘন্টা ছিল বা এক মুহূর্ত তাঁকে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী। সাহচর্যের সময় অনুপাতে তাদের সাহাবীত্বের মর্যাদা নির্ণয় করা হবে।'

[আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াইয়া, পৃষ্ঠা ৫১]

ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা যে মুসলিম তাঁকে দেখেছেন তিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

[ইমাম বুখারী রহ. ফাযায়েলুস সাহাবা অধ্যয়ে এ শব্দ দ্বারা একটি বাব তথা পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। দেখুন ৩/৫। তার শব্দাবলী হচ্ছে,

«بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মর্যাদার পরিচ্ছেদ, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা যে মুসলিম তাঁকে দেখেছেন তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত]

সুহবাত তথা সান্নিধ্যের শাব্দিক অর্থের সাথে এ অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনুরূপ। কেননা সুহবাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা, তার সাথে লেগে থাকা ও সান্নিধ্যে থাকা। ইবন ফারিস রহ. বলেছেন, সাদ, হা ও বা (صحب) একই মূল ধাতু থেকে নির্গত, যা কোনো কিছুর সাথে মিল ও নিকটে অবস্থানের অর্থে বুঝায়, এ শব্দ থেকে বলা হয় (الصاحب) বা সাথী ।

[মু‘জামু মাকায়ীসুল লুগাহ, ইবন ফারিস, পৃষ্ঠা ৫৮৭।]

অতএব, এ সাহচর্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই এবং সাহাবী হতে দীর্ঘ সান্নিধ্য ইত্যাদি কোনো শর্তারোপও করা যাবে না।

এ কথার দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

“অতঃপর তাকে ও নৌকা আরোহীদেরকে আমি রক্ষা করলাম”। [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

“যেমনিভাবে লা‘নত করেছি আসহাবুস সাবত তথা শনিবার ওয়ালাদেরকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“নিশ্চয় তোমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের এর ঘটনার (নিন্দুক) নারীদের ন্যায় (সাথী) হয়ে পড়েছ। ”[মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১৮]

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, সুহবাত তথা সাথী হওয়া একটি ইসমে জিনস তথা সামষ্টিক অর্থজ্ঞাপক নাম; যা অল্প ও বেশি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই বলা হয়, সে অমুকের সাথে ছিল এক বছর বা এক মাস বা এক মুহূর্ত।
[মিনহাজুস সুন্নাহ, ৮/৩৮৮ ও ৩৮৯।]

আবার আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য সান্নিধ্য; এমনকি পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে তাঁকে দেখা যে যথেষ্ট সাহাবী হবার জন্য, তার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে উল্লেখিত হাদীসেই পাওয়া যায়।
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ :فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ :فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ :هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ

“(ভবিষ্যতে) মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যখন তাদের একদল জিহাদ করতে থাকবে। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন? তারা বলবেন, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর মানুষের মধ্য থেকে একদল যুদ্ধ করতে থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো ব্যক্তি আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে দেখেছন? তারা বলবেন, জি হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর মানুষের আরেকটি দল জিহাদ করতে থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবে‘ঈগণকে দেখেছেন? তখন লোকেরা বলবে, জি হ্যাঁ। তখন তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে।”
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩২, হাদীসের শব্দাবলী মুসলিমের]

উপরোক্ত হাদীসে যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন তাঁকে সাথী বলা হয়েছ , তাহলে বলতে পারি , কারো দেখা লাভকারী হলো তার সাহাবী।

আবার ঈমানের সাথে শুধু দেখা পাওয়াই যে সাহাবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এ অর্থে নিম্নোক্ত হাদীসটিও তার প্রমাণ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا «قَالُوا :أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ :»أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ».

“আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসে নি তারা আমাদের ভাই।”
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯।]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ».

“তোমরা আমার সাহাবী; কিন্তু আমার ভাই তো তারাই যারা আমাকে দেখেনি অথচ আমার প্রতি ঈমান এনেছে”।
[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১২৬০১]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ভাইদেরকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন তাদের ও সাহাবীগণের মধ্যে পার্থক্য হলো , **তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ ও দেখা করা**। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন ও তাঁকে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী।
[মিনহাজুস সুন্নাহ, ৮/৩৮৯]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব সাহাবী কেবল একনজর দেখেছিলেন, তাদের দেখা কেবল চোখের দেখাতে সীমাবদ্ধ ছিল না, (যেমন কাফির ও মুনাফিকরা দেখেছে) বরং আল্লাহ সেসব সৎলোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ, আনুগত্য ও ভালোবাসার জন্য দেখার তাওফিক দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তারাও ঈমান আনয়ন, তাঁর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বগ্রহণ, তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতাপোষণের মানসে তাঁকে দেখেছেন। সুতরাং তাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখার কারণে এ মহামূল্যবান উঁচুমর্যাদা তাদের জন্য অর্জিত হওয়া যথাযথ। [মিনহাজুস সুন্নাহ, ৮/৩৮৮]

কেনই বা হবে না; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁর সান্নিধ্যে থাকা যে একাধারে কল্যাণ, বরকত ও হিদায়াতের আলো পাওয়া হিসেবে বিবেচিত, এটা একমাত্র একজন হতভাগা অন্ধ ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, বর্তমানে কিছু নিকৃষ্টমানের বিদ'আতী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবীদের ব্যাপারে হিংসার বশবর্তী হয়ে যেসব কথা বলে থাকে যে, সাহাবী হতে হলে দীর্ঘ সাহচর্য ও সান্নিধ্যের শর্ত রয়েছে, এটা তাদের সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, কুরআন ও হাদীসের দাবি মানতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। আর তাদের এই অস্বীকৃতির কারনে তারা মুমিনদের পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সহীহ আক্বীদার সরাসরি বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে।

সংক্ষেপে ইবনে হাজারের সংজ্ঞাটি এখানে তুলে ধরা যায়। সেটাই সহজ, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। তিনি বলেন-

الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنَابِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَام

'যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী।'

' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে' এবং 'মুসলিম হিসাবে মৃত্যু'র শর্তের কারণে প্রিয় নবীর 'সাহাবী' হিসাবে বিবেচিত হবেন তারাই -

এক- যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন।

দুই- যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন।

তিন- যাঁরা মোটেও সাহচর্য পাননি, (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)

চার- যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ- যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।

ছয় - যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।

সাত- দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি। তাঁরা সকলেই সাহাবী।

কিন্তু মনে রাখতে হবে পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী নয়। এমনকি পরিবর্তীতে ঈমান এনেও তিনি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান। কারণ 'সাহাবী' হতে হলে মুমিন হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। আবার ঐ ব্যক্তি সাহাবী নন, নবীজীর সঙ্গে যার ঈমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে 'সাহাবী' বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমিন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কারণ 'প্রিয় নবীকে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...' এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি। [উসওয়ায়ে সাহাবা]

সাহাবিদের সংখ্যা

সাহাবীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। সাহাবিদের জীবনী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত কিতাব রচনা করা হয়েছে, সবগুলো থেকেও তাদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা জটিল। এ কথা সেসব গ্রন্থের রচয়িতারাও অকপটে স্বীকার করেছেন। আল্লামা ইবনে আসির জাজারি রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ উসদুল গাবাহতে লেখেন,

و لو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء

.

'সে সময় সাহাবিরাই যদি অন্যান্য সাহাবিদের নাম সংরক্ষণ করতেন।
তাহলে তাদের সংখ্যা আলেমদের বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হতো।'[উসদুল গাবাহ: ১/০৩]
তবে বিভিন্ন হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর সাহাবির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল অবধি তৈরি হয়েছিল সাহাবিদের এক বিশাল কাফেলা।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন,

اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاس

'যারা কালিমা পড়ে, আমাকে তাদের একটি তালিকা দাও।'[সহিহ বুখারি : ৩০৬০, কিতাবুল জিহাদ; মুসনাদে আহমাদ: ২৩২৫৯; সহিহ মুসলিম: ৩৭৭]

নির্দেশ পালন করলে দেখা গেল সেখানে পনেরোশো মুসলমানের নাম। [সহিহ বুখারি: ৪২৭৬, কিতাবুল মাগাজি, মক্কাবিজয় অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ: ৩০৮৯, সহিহ মুসলিম: ২৬০৬ (১১১৩)]

কিন্তু এ নির্দেশ ঠিক কখন দেওয়া হয়েছিল, হাদিসে তা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এজন্য সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মতপার্থক্য, এখতেলাফ । সহিহ বুখারির বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারির লেখক হাফেজ ইবনে হাজারের মতে, এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উহুদযুদ্ধে যাত্রার পূর্বে। আবার ইবনে তিনের মতে গাযওয়ায়ে খন্দকের পূর্বে। কিন্তু দাউদির মতে এই ঘটনা হুদাইবিয়া অভিযানের সময়কার; এরপর এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পেতে থাকে। একপর্যায়ে মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে তা দাঁড়ায় দশ হাজারের কোটায়। [সহিহ বুখারি: ৪২৭৬, কিতাবুল মাগাজি, মক্কাবিজয় অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ: ৩০৮৯; সহিহ মুসলিম: ২৬০৬ (১১১৩)]

মক্কাবিজয়ের পর সমগ্র আরবে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেলে এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুনাইনের যুদ্ধে সেবক এবং নারী ছাড়াই সাধারণ যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় বারো হাজারে, তাবুকযুদ্ধে ত্রিশ হাজারে এবং বিদায় হজে চল্লিশ হাজারে। [উসদুল গাবাহ: ১/১২; তাবাকাতে ইবনে সাদ, তাবুকযুদ্ধ; মুকাদ্দামায়ে ইবনিস সালাহ, অধ্যায় নং: ৩৯, পৃষ্ঠা: ১৫]

মোটকথা, দশম হিজরির আগমন ঘটতেই মক্কা ও তায়েফের প্রতিটি ব্যক্তিই মুসলমান হয়ে রাসুলের সাথে বিদায় হজে শরিক হন। [মুকাদ্দামাতুল ইসাবাহ: ১/১৬]

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর বর্ণনামতে, রাসুলের ইন্তেকালের সময় মুসলমানের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এর মধ্যে মদিনাতেই ছিল ত্রিশ হাজার। বাকি ত্রিশ হাজার মদিনার বাইরে বিভিন্ন স্থানে।

আবু যুরআ রাজির মতে, নবীজির ইন্তেকালের সময় তাকে দেখেছেন এবং তার থেকে হাদিস শুনেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে লাখেরও বেশি। তাদের প্রত্যেকেই রাসুলের নিকট শোনা হাদিস অন্যের কাছে বর্ণনা করেছেন। [তাজরিদ: ১/৩; মুকাদ্দামাতুল ইসাবাহ: ০৩]

ইসতিআব গ্রন্থের পাদটীকায় আল্লামা ইবনে ফাতহুন রহ. উপরিউক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে লেখেন, 'আবু যুরআ রহ. এখানে কেবল বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা-ই বলেছেন; নতুবা এর বাইরে সাহাবিদের সংখ্যা আরও বেশি। '[প্রাগুক্ত]

সারকথা হলো, বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহাবির নাম এবং সংখ্যার কথা তো আমরা বলতে পারি; কিন্তু এর বাইরেও যে কত সাহাবি আছেন, তা নির্ধারণ করা আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

উসদুল গাবাহর গ্রন্থকার লেখেন, দীনি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে খোদ সাহাবিদের পক্ষেই তাদের কাফেলার পূর্ণ সদস্যসংখ্যা গণনা করে রাখা সম্ভব হয়নি। [মুকাদ্দামায়ে উসদুল গাবাহ: ০৩]

আবার দেখা গিয়েছে যে অনেক সাহাবি ছিলেন গ্রাম্য-মরুবাসী (বেদুইন)। তাদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করতে না পারা কিংবা তাঁদের নাম অজানা থাকাটাই স্বাভাবিক।

আদালতে সাহাবা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে : عدول كلهم الصحابة তথা সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদেল। এ ব্যাপারে আকিদার প্রসিদ্ধ কিতাব আল-মুসায়ারার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল মুসামারায় বলা হয়েছে,

اعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة رضي الله عنهم وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকের জন্য আদালত সাব্যস্ত করা, তাদের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব। [আল মুসামারা, ২/১৫৮ মাকতাবাতুল আযহার।]

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ تَرٰىهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضۡوَانًا سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِى التَّوۡرٰىةِ ۖ وَمَثَلُهُمۡ فِى الۡاِنۡجِيۡلِ ۚ كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰى عَلٰى سُوۡقِهٖ يُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَـغِيۡظَ بِهِمُ الۡكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنۡهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদাহয় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নিগর্ত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের। (সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৯)

আল্লামা কুরতুবি রহ. এ ব্যাপারে বলেন,
সাহাবায়ে কেরামের সকলেই আদেল। আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন।
তাঁর নির্বাচিত বান্দা এই সাহাবীগন। । নবী-রাসুলদের পর সৃষ্টিজগতের মধ্যে তারাই 'সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদেল। আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন হচ্ছেন সর্বশেষ্ঠ মানব। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং উম্মাহর ইমামগণের অভিমত। [তাফসিরে কুরতুবি, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৯]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ ব্যাপারে বলেন,

إتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

.

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ ব্যাপারে একমত যে, সকল সাহাবি আদেল। গুটিকয়েক বিদআতি ছাড়া কেউই এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে না। [আল ইসাবাহ, ১/১৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]

একটু খেয়াল করলেই বুঝা যাবে যে , আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সকল সাহাবির ক্ষেত্রেই এ আকিদা পোষণ করেন; তাঁদের কেউইবা উসমান রা. এর শাহাদাত-পরবর্তী ফেতনায় জড়িয়ে পড়ুন না কেন।'

ইমাম নববি রহ. আত-তাকরিব গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন,

الصحابة كلهم عدول ،من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به

'সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদেল। তাদের মধ্যে যারা ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছেন তারাও এবং যারা জড়াননি তারাও। নির্ভরযোগ্য আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই।[তাদরিবুর রাবি, পৃ. ৪৮২, দারুল হাদিস]

আবার হাফেজ ইবনুস সালাহ রহ. এ ব্যাপারে মন্তব্য দেখি তাহলে জানতে পারি, তিনি বলেন,

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ،ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم في الاجماع

.

'মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, সকল সাহাবি আদেল। তাদের মধ্যে যারা ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছেন তারাও আদেল; ইজমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় এমন সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই।'[মুকাদ্দামা ইবনুস সলাহ, পৃ. ২৯৫, দারুল ফিকর]

এই সকল উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীই আদেল; তাঁরা কোনো ফেতনায় জড়িয়ে পড়ুন না কেন, তার পরও তারা আদেল।

আদেল কাকে বলে?

এই যে আদেল শব্দটা ব্যবহার করছি, আসলে আদেল শব্দের অর্থ কি? এবার আমরা আদেল শব্দের অর্থ জানব। আদেল কাকে বলে? এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়? আদালতে সাহাবা বলতে কী উদ্দেশ্য?

আদেল শব্দের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন,

المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة

'আদেল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তির মাঝে এমন গুণ থাকা, যা তাকে সর্বদা তাকওয়া অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে এবং সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। [নুযহাতুন নযর, পৃ. ৬৯, মাজমাউল মালিক ফাহাদ]

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساويه

'আদেল ওই ব্যক্তিকে বলা হবে, যিনি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন এবং মন্দের চেয়ে তার ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হয়। [আর রওযুল বাসিম ফিয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম, ১/৫৫]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. আদল শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

من سلم أن يكون منه كبيرة من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار وكانت محاسنه اكثر من مساويه فهو عدل

.

'কবিরা গুনাহ; যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের হুঁশিয়ারি প্রদান করেছেন, যে ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকে আর তার মন্দ কাজের তুলনায় ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হয়-সে আদেল। [মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, ৩/৩৩৩, দারুল বাশাইর]

এই সব থেকে বুঝা যায়, আদেল ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এবং তাকওয়া অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো , যদি কেউ সগিরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে সে আদেল হতে পারবে কি না?

এ ব্যাপারে ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারে বলা হয়েছে,

و مرتكب صغيرة بلا إصرار إن إجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره ،قال وهو معنى العدالة

.

'কেউ যদি বারবার সগিরা গুনাহে লিপ্ত না হয় এবং সকল কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আর তার সগিরা গুনাহের চেয়ে ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হয় (সে আদেল বলে গণ্য হবে), এটাই হলো আদালতের অর্থ। [ফতোয়ায়ে শামি, ৮/২১৪, আশরাফিয়া]

সাহাবায়ে কেরামের তাবাকা (শ্রেণি)

উলামায়ে কেরাম সাহাবীদের বারোটি তাবাকার আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বেশিও বলেছেন, আবার কী কী কম। যেমন , মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ বলেছেন পাঁচটির কথা। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় যে বারোটি স্তর বা তাবাকা করা হয়েছে, নিচে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো:

প্রথম তাবাকা- প্রথম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যাঁরা মক্কায় একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেমন, আবু বকর উমার , উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।

দ্বিতীয় তাবাকা- দ্বিতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন দারুন নদওয়ায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। আর এটা হলো উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তখন তাকে দারুন নদওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তিনি সহ মক্কাবাসীর মধ্য থেকে একদল সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

তৃতীয় তাবাকা- আর তৃতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবী, যারা হাবশায় হিজরত করেছেন।

চতুর্থ তাবাকা- আর চতুর্থ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা 'আকাবা নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চম তাবাকা- আর পঞ্চম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অধিকংশ ছিলেন আনসার সাহাবী।

ষষ্ঠ তাবাকা- আর ষষ্ঠ স্তরের সাহাবীগণ হলেন সেসব মুহাজির, যারা মদীনায় প্রবেশ ও মসজিদ বানানোর পূর্বে 'কুবা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছেছেন।

সপ্তম তাবাকা- আর সপ্তম স্তরের সাহাবী হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ْلَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। **[সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬০৮]**

অষ্টম তাবাকা- আর নবম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন:

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" **[সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]**

আর বায়'আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়া নামক স্থানে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফির কর্তৃক ওমরা পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

নবম তাবাকা- আর দশম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, 'আমর ইবনুল 'আস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ এবং এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক।

দশম তাবাকা -আর দশম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, 'আমর ইবনুল 'আস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ এবং এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক।

একাদশ তাবাকা- আর একাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তারা হলেন কুরাইশ গোত্রের একটি দল। যাঁদের মধ্যে কুরাইশের একটি বড় দল শামিল ছিল।

দ্বাদশ তাবাকা- আর দ্বাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন ছোট্ট শিশু-কিশোর কম বয়সীদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন মক্কা বিজয়ের দিন, বিদায় হজের দিনসহ বিভিন্ন সময়ে এবং তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। যাঁদের মাঝে ছিলেন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা-এরা রাসূলের দরবারে এলে তিনি তাঁদের দু'জনের জন্য দুআ করেছিলেন, তাঁদের মাঝে আরও ছিলেন, আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলাহ এবং আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁরা দু'জন প্রিয় নবীকে তাওয়াফের সময় এবং যমযমের নিকট দেখেছিলেন। [শানে সাহাবা]

আবার মোটামুটিভাবে সাহাবীগণের স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের বিষয়টিও প্রসিদ্ধ:

প্রথম স্তর: বড় বড় সাহাবীগণের স্তর। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।

দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ।

তৃতীয় স্তর: ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যারা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছোট ছিলেন।
উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তারা সকলেই যে ন্যায়পরায়ণ এবং নবীগণের পরেই তারা যে দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের সকলের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَخَبِيْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

সুতরাং সততাও ন্যায়পরয়ণতার প্রশ্নে সাহাবীগণের সকলেই সমান।

সাহাবি-যুগ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির সময় থেকে শুরু হয়ে সাহাবায়ে কেরামের মোবারক যুগের ব্যাপ্তি ছিল হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। মূলত এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছিল নবীজির অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী। তার পবিত্র জবানে উচ্চারিত হয়েছিল : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এক রাতে আমাদেরকে নিয়ে এশার সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেনঃ “তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ’ বছর পর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।’ [মুসলিমঃ ২৫৩৭] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুলের পবিত্র জবান থেকে এমন বাক্য শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধায় পড়ে যান। মূলত এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, সাহাবিযুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

[সহিহ বুখারি : ৬০১, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাহ, এশার পর কথা বলা প্রসঙ্গ; মুসনাদে আহমাদ : ৬০২৮; সহিহ মুসলিম: ৬৪৮০, (২৫৩৭)]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ও তাদের সময়কাল পর্যালোচনা করে আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে ওঠে।

৮৮ হিজরি, কারো কারো মতে ৯১ হিজরিতে মদিনার সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) । এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৬ কিংবা ১০০ বছর। তিনি নিজেই বলতেন, 'আমার ইন্তেকালের পর তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিস বর্ণনাকারী দ্বিতীয় কাউকে পাবে না। [আল-ইসতিআব, তাজকিরাতু সাহল ইবনে সাদ।]

হিজরি ৯০, কারো কারো মতে ৯১/৯২ অথবা ৯৩ সন। বসরায় অবস্থানকারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)। এ সময় তার বয়স হয়েছিল সর্বোচ্চ ১০৩ বছর। [উসদুল গাবাহ]

কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, রাসুলের আর কোনো সাহাবি কি জীবিত আছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'রাসুলকে কেবলমাত্র দেখেছিল, গ্রামে অবস্থানকারী এমন কয়েকজন হয়তো জীবিত আছেন; কিন্তু নবীজির সান্নিধ্যে থাকা কেউ আর জীবিত নেই।[উসদুল গাবাহ]

এই সাহাবী দুজনই তাদের নিজ-নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদেরকে সর্বশেষ সাহাবি হিসেবে দাবি করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মক্কায় অবস্থানকারী আবু তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা রা. ছিলেন পৃথিবীকে বিদায় জানানো সর্বশেষ সাহাবি। হিজরি ১০০ সনে মক্কাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি নিজেই বলতেন, 'পৃথিবীতে আজ আমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। '[আল-ইসতিআব]

মুল কথা হলো, সহিহ হাদিস এবং বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে এ কথা সুপ্রমাণিত যে, হিজরি প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার সাথে-সাথে সাহাবিদের মোবারক যুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের কর্ম ও অবদানের স্মৃতি।

সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۝
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۝
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

"আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি আপনাকে সেই সময়ও দেখতে পান যখন আপনি দাঁড়ান। আর তিনি সিজদায় অবনত লোকদের মধ্যে আপনার গতিবিধির উপরও লক্ষ্য রাখেন। [সূরা আশ্ শোয়ারা: আয়াত ২১৭-২১৯]

এখানে 'লক্ষ্য রাখেন' দ্বারা কয়েকটি অর্থ হতে পারে:
এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে ,

একঃ আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে উঠা-বসা ও রুকু'-সিজদা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন।

দুই: রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথীরা (যাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ হিসেবে 'সিজদাকারী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।) তাদের আখেরাত গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না।

তিন: আপনি নিজের সিজদাকারী সাথীদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন।

চারঃ সিজদাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন। [তাবারী, বাগভী]

এখানে রসূলুল্লাহ সা.-এবং সাহাবায়ে কিরামের এইসব গুণ বৈশিষ্ট্য যে উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে আপনি আল্লাহর রহমত এবং অফুরন্ত সাহায্য সহযোগিতা লাভের অধিকারী। তিনি তো সবই দেখেন, সবই শুনেন। তাঁর পথে আপনার যাবতীয় চেষ্টা সংগ্রাম এবং আপনার সিজদায় অবনত সাথিদের মাঝে আপনার তৎপরতা, সবই তাঁর দৃষ্টিপথে রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের গুণ বৈশিষ্ট্য ছিল অতুলনীয়, ঈমান অত্যন্ত বিশুদ্ধ, মজবুত ও পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের সোনার অন্তরে ঈমান গেঁথে গিয়েছিল। তাঁদের ঈমান ছিল পর্বত সমান।
সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বার বার দুঃখ-কষ্ট এসেছে। কাফেররা তাঁদের উপর অসহনীয় নির্যাতন করেছে। কাফেরদের একটাই দাবি ছিল, মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দাও। তাহলে আমাদের থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ছিল নানা প্রলোভন ও হাতছানি।
কিন্তু সাহাবীগণ এতোই কঠিন ঈমানের ছিলেন যে, তাঁদের প্রলোভন, অত্যাচার অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরকের প্রশ্নে তাঁরা কখনো আপোষ করেননি। সর্বদা ঈমানকে বুকে আগলে রেখেছেন। ঈমানের জন্য জান-মাল তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন। পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি হাতে জিহাদ করেছেন । মূলত সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের স্বাদ পেয়েছিলেন। ঈমানের স্বাদ লাভের যাবতীয় উপকরণ তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর একবার ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করলে আর কোনো কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় না!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ :أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে :

- ★ ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সব থেকে প্রিয় হওয়া।

- ★ ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য মহব্বত করা।

- ★ ৩. কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত ঘৃণ্য হওয়া। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৬

[৬৫] -তারীখে দিমাশক ২০/৩৩১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১০৯; [মূল ঘটনাটি সহীহ মুসলিমেও (বর্ণনা নং ১৭৪৮) রয়েছে।]

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের (তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) মধ্যে নবীজী ও সাহাবীদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং শেষে ওইসব বিষয়ে নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করেছিলেন। তার মন্তব্যের একটি অংশ হল-

وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ .وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা (মুহাম্মাদের অনুসারীরা) বাড়ছে, না কমছে। তুমি বলেছ, বাড়ছে। আসলে ঈমানের বিষয়টি এমনই, তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মুমিনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইসলাম গ্রহণের পর কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে কি না। তুমি বলেছ, না। আসলে ঈমান এমনই হয় যখন এর স্বাদ অন্তরে গেঁথে যায়। [-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭]

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন-

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ

তাঁদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ় ছিল। [মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ২০৬৭১] সাহাবায়ে কেরামের তাঁদের পুরো জীবনই ছিল অটল ঈমানের প্রতিচ্ছবি। তাঁদের চলাফেরা, আখলাক-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন ...সর্বত্র ছিল তাঁদের সুন্দর ঈমানের ছাপ। তাঁদের ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত কিছু ঘটনা দেখলে তাদের ঈমান সম্পর্কে আর স্পষ্ট হয়ে যায়ধারনা পাওয়া যায়।

এক.

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই মায়ের প্রতি যত্নবান ও সদাচারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা বলল, তুমি এ কী দ্বীন গ্রহণ করেছ? তুমি তা ত্যাগ করো, নতুবা আমি পানাহার ছেড়ে দেব। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ তোমাকে মাতৃহন্তা বলবে। সা'দ রা. বললেন-

لَا تَفْعَلِي يَا أُمَّ، إِنِّي لَا أَدَعُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ

আম্মা! আপনি এমন করবেন না। আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। এ কথা শুনেও তাঁর মা দুই দিন না খেয়ে কাটাল। এতে মহিলা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। মহিলা ভেবেছে, এই অবস্থা দেখলে তার মা-ভক্ত ছেলের অন্তরে 'দয়া'র সৃষ্টি হবে এবং মাকে বাঁচানোর জন্য সে ইসলাম বর্জন করবে! কিন্তু সা'দ রা. এবার আরো পরিষ্কার ভাষায় বললেন-

،يَا أُمَّهْ، تَعْلَمِينَ وَاللهِ يا أُمَّهْ، لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ فخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا، مَا تَرَكْتُ هَذَا لِشَيْءٍ إِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي

আম্মাজী! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর কসম, আপনার যদি একশ প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবু আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। আপনার ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন। [সহীহ মুসলিমেও (বর্ণনা নং ১৭৪৮)]

এ ঘটনা থেকে আন্দায করা যায় সা'দ (রাঃ) এর ঈমান কত মজবুত ছিল! যার কাছে জন্মদাতা মা ও হার মানায়, যেখানে পৃথিবীর সবকিছু একদিকে আর ঈমান আরেকদিকে। সবকিছু ত্যাগ করা সম্ভব, ঈমানত্যাগ সম্ভব নয়। সা'দ (রাঃ) তাঁর মাকে খুব ভালবাসতেন এবং মায়ের প্রতি সদাচারীও ছিলেন; এজন্যই মা তাকে ঈমান থেকে ফেরানোর জন্য 'মায়ের ভালবাসা'কেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে ভালবাসি ঠিকই মা, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে বেশি নয়, ঈমান ও সত্য দ্বীন থেকে বেশি নয়। কারণ, ঈমানবিহীন জীবন জীবনই নয়।

দুই.

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.-এরই আরেকটি ঘটনা, তিনি বলেন, আমি সপ্তম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলাম। হুবলা বা হাবলা (এক প্রকার গাছ)-এর পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছু ছিল না। (এরূপ খাবারের কারণে) আমাদের কেউ কেউ বকরির মত (শক্ত ও শুকনো) মলত্যাগ করত। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪১২]

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সা'দ রা. ও তাঁর সঙ্গীদের অন্তরে ঈমান গেঁথে গিয়েছিল। তাঁরা ঈমানকে পৃথিবীর সবকিছু থেকে মূল্যবান মনে করতেন। এজন্য গাছের পাতা খেয়ে দিন যাপন করেছেন। তবু ঈমান ছাড়েননি।

তিনঃ

উমর রা. তখন আমীরুল মুমিনীন। ইসলামের জয়ধ্বনি চতুর্দিকে বেজে গেছে। বাজতে শুরু করেছে প্রসিদ্ধ শহর শামেও। এই শহরের অবস্থা-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন শহরের গভর্নর আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রা.।
উমর রা. উটে করে চললেন। দীর্ঘ পথ। চলতে চলতে সামনে একটা অগভীর পানির স্থান পড়ল। তিনি উট থেকে নামলেন। মোজা জোড়া খুলে কাঁধে রাখলেন। তারপর উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে স্থানটি পার হলেন। আবু উবায়দা রা. বললেন, আপনি আমীরুল মুমিনীন হয়ে এমন করছেন! আমার মনে হয় না, শহরবাসী আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে!
উমর রা. তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন-

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ، أَذَلَّنَا الله

আমরা ছিলাম অপদস্থ জাতি। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্যভাবে সম্মান খুঁজি তাহলে তিনি আমাদের অপদস্থ করে ছাড়বেন। [মুসতাদরাকে হাকেম ১/১১৯-১২০]

এ থেকে বোঝা যায় উমর রা.-এর অন্তরে শুধু ইসলামই প্রোথিত হয়নি; বরং এই অনুভূতিও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একমাত্র ইসলামেই সম্মান নিহিত। ইসলাম ছাড়া অন্যপথে সম্মান খুঁজলে কপালে শুধু লাঞ্ছনাই মিলবে।

চার.

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দান-সদকার প্রতি উৎসাহিত করলেন। তখন উমর রা.-এর কাছে বেশ সম্পদ ছিল। তিনি অর্ধেক সম্পদ দান করলেন। আর আবু বকর রা. ঘরে যা ছিল সব নিয়ে এলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন-

أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ

আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। [জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৭৫]

ঘরের সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে এমন কথা বলতে পারা কেবল আবু বকর রা.-এর মত পর্বতসম ঈমানদারের পক্ষেই সম্ভব। আমরা শুধু সে ঈমানের আলো থেকে কিঞ্চিৎ আলো লাভের আশায় তাঁদের ঘটনাগুলো বারবার পড়ি, বারবার শুনি।

পাঁচ.

উমর রা. ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। এতে পুরো কুরাইশে হইচই পড়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর তিনি জানতে চাইলেন, কুরাইশের কে সংবাদ প্রচার করে? একজন বলল, জামিল ইবনে মা'মার। তিনি জামিল ইবনে মা'মারের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কি জানো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীন গ্রহণ করেছি? জামিল উত্তর না দিয়ে ত্বরিত উঠে দাঁড়াল। উমর রা. তার পেছনে চললেন। জামিল কা'বার দরজায় গিয়ে ঘোষণা করল, হে কুরাইশ, ইবনুল খাত্তাব 'সাবী' হয়ে গেছে!
উমর রা. পেছন থেকে প্রতিবাদ করে বললেন-

كَذَبَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ بِاللهِ وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ

সে মিথ্যা বলেছে; আমি বরং ইসলাম গ্রহণ করেছি, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করেছি।
এ কথা শোনামাত্র কুরাইশের লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্য মাথার উপর ওঠা পর্যন্ত লড়াই চলল। একপর্যায়ে উমর রা. ক্লান্ত হয়ে বসে গেলেন। কুরাইশের লোকেরা তাঁর মাথার উপর দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাদের বলছিলেন-

افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللهِ لَوْ كُنَّا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُم
তোমাদের যা ইচ্ছা কর। আল্লাহর কসম, আমরা যদি তিন শ লোক হতাম তাহলে তোমাদেরকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হত। নতুবা আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যেতাম।
এমতাবস্থায় রেশমি কাপড় পরিহিত এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, উমর 'সাবী' হয়ে গেছে। লোকটি বলল, তাকে ছেড়ে দাও। একজন নিজের জন্য একটা ধর্ম পছন্দ করেছে, এতে তোমাদের কী? তোমরা কি মনে কর, বনী আদী তাদের লোককে তোমাদের হাতে এমনিতেই ছেড়ে দেবে? তাকে ছেড়ে দাও।
একথা শুনে কুরাইশের লোকেরা উমর রা.-কে ছেড়ে দিল। মনে হল তাঁর শরীর থেকে যেন একটা চাদর সরিয়ে নেওয়া হল। [সহীহ ইবনে হিব্বান, বর্ণনা ৬৮৭৯; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৭৪]

এ ঘটনা প্রমাণ করে উমর রা.-এর ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাই ঈমানের জন্য তিনি কাফেরদের মারধর-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেছেন। শুধু তাই নয়; তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কাফেররা যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তিনি ঈমান ত্যাগ করবেন না।

ছয়. খাব্বাব ইবনে আরাত রা. জাহেলী যুগে কর্মকার ছিলেন। আস ইবনে ওয়াইলের কাছে তাঁর কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। পাওনা চাইতে গেলে আস বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরী না করলে আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব রা. বললেন-

لاَ، وَاللهِ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ

আল্লাহর কসম, তুমি যদি মারা যাও তারপর পুনরায় জীবিত হও, তবু আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কুফরী করব না। [সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৯৫]

আস ইবনে ওয়াইল মনে করেছিল, খাব্বাব রা. পাওনার জন্য কুফুরী করে ফেলবেন; কিন্তু খাব্বাব রা. তাকে জানিয়ে দিলেন, ঈমানের বিপরীতে অর্থ-বিত্ত কিছুই না। অর্থের জন্য কুফরী করা সম্ভব না; কখনোই না

সাত.

মক্কা-জীবন সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল। যিনি-ই ইসলাম গ্রহণ করতেন কাফেররা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, অসহনীয় অত্যাচার করতো । কাফেরদের অত্যাচার থেকে কেউই নিরাপদ থাকেননি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নন। তাদের নির্যাতনের কারণে ইবাদত-বন্দেগী করা তো দূরের কথা, ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকাই কঠিন ছিল।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে নিরাপদে দ্বীন চর্চার জন্য অর্থসম্পদ ও ঘরবাড়ি , পরিবার ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে হাবাশা-মদীনা হিজরত করেন। এই হিজরত তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তার এক জ্বলন্ত সাক্ষী।

একবার আবু বকর রা. হাবাশা হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে যান। পথে মক্কার এক নেতা ইবনুদ দাগিনার সঙ্গে দেখা হল। ইবনুগ দাগিনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আবু বকর রা. বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি এখন ইচ্ছে করেছি, শহর-নগরে ঘুরব আর আল্লাহর ইবাদত করব। সে বলল, আপনার মত মানুষ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না এবং আপনার মত মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না।

আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন। আত্মীয়তা রক্ষা করেন। অক্ষমের বোঝা বহন করেন। মেহমানদারি করেন। দুর্যোগে মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দেব। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে গিয়ে আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন।
আবু বকর রা. মক্কা ফিরে এলেন। ইবনুদ দাগিনা কুরাইশের নেতাদের বলল, আবু বকরের মত মানুষ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না এবং তার মত মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন লোককে বের করে দিচ্ছেন, যিনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, ...।
ইবনুদ দাগিনার আশ্রয়কে কুরাইশের নেতারা মেনে নিল। কিন্তু তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল, তুমি আবু বকরকে বলে দাও, সে যেন নিজের ঘরে ইবাদত করে। সলাত পড়ে এবং যত খুশি তিলাওয়াত করে। তবে তা দ্বারা যেন আমাদের কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে না করে। কেননা প্রকাশ্যে করলে আমাদের স্ত্রী-পুত্ররা ফেতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।
ইবনুগ দাগিনা কথাগুলো আবু বকর রা.-কে জানিয়ে দিল। আবু বকর রা. নিজের ঘরেই ইবাদত করতে থাকেন। ঘর ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে নামায ও তিলাওয়াত করতেন না। কিছুদিন পর তাঁর মনে অন্য এক খেয়াল এল। তিনি ঘরের আঙিনায় নামাযের জায়গা করে সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে লাগলেন। কাফেরদের স্ত্রী-সন্তানরা সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করে। তারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর রা. কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না।
এতে কুরাইশের নেতারা ঘাবড়ে গেল। তারা ইবনুগ দাগিনাকে ডেকে বলল, আমরা এই শর্তে তোমার নিরাপত্তা বহাল রেখেছিলাম যে, সে নিজের ঘরে ইবাদত করবে। কিন্তু সে তা অমান্য করে ঘরের আঙিনায় নামাযের স্থান করে সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করছে। আমাদের আশঙ্কা হয়, এতে আমাদের স্ত্রী-পুত্ররা ফেতনার শিকার হবে। তুমি তাকে বল, সে যদি নিজের ঘরে ইবাদত করে তবে ঠিক আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে করলে যেন তোমার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেয়।
ইবনুগ দাগিনা আবু বকর রা.-কে তা জানালে তিনি বললেন-

إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

আমি তোমার নিরাপত্তা ফেরত দিচ্ছি। আমি আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট। [-সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯০৫]

এইযে শত্রুর চারিদিক থেকে হুমকি সত্ত্বেও নিরাপত্তার আশ্রয় ফিরিয়ে দেওয়া তো তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের রয়েছে রব্বুল আলামীনের আশ্রয়ের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগন

স্বভাবে নম্রতা, হৃদয়ের কোমলতা এবং অনুপম কিছুর প্রভাবে সহজেই প্রভাবিত হওয়া একজন ভালো মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই সেই ব্যক্তি পারে সব ধরনের উপদেশ, শিক্ষা আর তরবিয়াতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে।
রাহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তাআলা সত্যদীনসহ, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যাঁরা ঈমানসহ রাসুল (স.)-এর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়েছেন এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই সাহাবি। সাহাবিরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষ। সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য তাঁরা অনুসরণীয়। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা-

جَزَآؤُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَآ اَبَدًا‌ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ‌ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ خَشِىَ رَبَّهٗ

অর্থাৎ তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তাঁরা তার পালনকর্তাকে ভয় করে (সুরা বাইয়িনা: ৮)।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ‘তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।’ [বুখারী : ৩৬৭৩; মুসলিম : ৬৬৫১]

হাদীসে উল্লেখিত এক মুদ সমান তিনপোয়া। সামগ্রিক বিচারে সাহাবরা সকলে অন্য সকল উম্মত অপেক্ষা উত্তম। তবে সাহাবারা নিজেরা কিন্তু সকলে একই স্তরের নন। বরং কেউ কেউ মর্যাদায় অন্যদের চেয়ে উত্তম। তাদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস ও স্তর রয়েছে। নিম্নে তাদের ক্রমধারা প্রদত্ত হলো :

সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চার খলিফা।

✿ আবূ বকর সিদ্দীক (রা:)

✿উমার বিন খাত্তাব (রা:)

✿উসমান বিন আফফান (রা:)

✿আলী বিন আবী তালীব (রা:)

এদের পরবর্তী স্তরে আছেন অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশশারাগণ। যারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী বলে পরিচিত। তাদের সম্পূর্ণ তালিকা হলো :

- **১] আবূ বাকর সিদ্দীক (রা:)**
- **২] উমার বিন খাত্তাব (রা:)**
- **৩] উসমান বিন আফফান (রা:)**
- **৪] আলী বিন আবী তালীব (রা:)**
- **৫] আবূ উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা:)**
- **৬] সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা:)**
- **৭] আবদুর রহমান বিন আওফ (রা:)**
- **৮] যুবাইর বিন আওম (রা:)**
- **৯] তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা:)**
- **১০] সাঈদ বিন যায়দ (রা:)**

এমনিভাবে মুহাজির সাহাবীবৃন্দ আনসারদের চেয়ে উত্তম।

বদর যুদ্ধে ও বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের চেয়ে উত্তম। অনুরুপভাবে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবরে চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের কি হল ?তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা হাদীদ: ১০]

নিচে বেঁচে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ১০ সাহাবির নাম, পরিচয় ও তাঁদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

১) ইসলামের প্রথম খলিফা এবং পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী **হজরত আবু বকর (রা.)**। তাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন আমর। উপাধি আতিক, সিদ্দিক। মায়ের নাম উম্মুল খায়র। আবু বকর (আরবি: أبو بكر الصديق; জন্মঃ ২৭ অক্টোবর ৫৭৩ – মৃত্যুঃ ২৩ আগস্ট ৬৩৪), ছিলেন একজন আরব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা যিনি রাশিদুন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬৩২ সাল থেকে ৬৩৪ সাল তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে শাসন করেন। তাঁর হাতে হজরত উসমান বিন আফফান, হজরত জুবাইর, হজরত তালহা, হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এর মতো বড় বড় সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের সাথি।

حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ :أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ :عَائِشَةُ فَقُلْتُ :مِنَ الرِّجَالِ قَالَ :أَبُوهَا، قُلْتُ :ثُمَّ مَنْ قَالَ :ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً

’আমর ইবনু ’আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন,

'আয়িশাহ্। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবূ বকর)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন্ লোকটি? তিনি বললেন, উমর ইবনু খাত্তাব অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম করলেন। [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২: সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১, হাঃ ২৩৮৪]

২) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, **উমর ইবনুল খাত্তাব** (আরবি: الخطاب بن عمر; ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ – ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ও প্রধান সাহাবীদের অন্যতম। আবু বকরের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। উমর ইসলামী আইনের একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ছিলেন । আমিরুল মুমিনিন খেতাবে ভূষিত হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজজা (রা.)। তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১০বছর ৬ মাস ৪ দিন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন।
অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমন্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে [সিরাতে ইবনে হিশাম] হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (ﷺ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।
ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলতেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلٍ بن هشام

'হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ই (আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেনসলামকে শক্তিশালী করে দাও। [তিরমিযী আরওয়াবুল মানাকের আবীহাফস উমার বিন খাত্তাব ২য় খন্ড ২০৯ পৃঃ]

উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে

হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীতমুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর মর্যাদা অতুলনীয়।

এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আসেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার ভেতরে প্রবেশ করেন। নাবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় সলাতে লিপ্ত ছিলেন। সলাতে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শুনলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

''যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল ('আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (ﷺ) তিলাওয়াত করলেনঃ

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

“ এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।’ (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, ‘সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।[সীরাতে ইবনে হিশাম]

প্রকৃতপক্ষে, উমার (রাঃ)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী[সিরাতে ইবনে হিশাম] কিংবা বনু যুহরা [মুখতাসারুস সীরাহ আবদুল্লাহ রচিত] কিংবা বনু মাখযুমের [ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, দ্রঃ মুখতাসারুস সীরাহ]
কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।
তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

‘হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ?

তিনি বললেন, ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।’

লোকটি বলল, ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে?
উমার বললেন, ‘মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।

লোকটি বলল, ‘উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।’

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘি দেয়ার মতো রাগে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত (রাঃ) একটি

সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব (রাঃ) তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে আসার শব্দ শুনলেন, তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'
তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

উমার (রাঃ) বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় বোন জোর করে ভাইকে স্বামী থেকে আলাদা করে দিলেন। এতে আরও রেগে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গালে এমন এক থাপ্পর দিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বোন রাগ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيْ غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

''উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

শাহাদতের এ বাণী শোনা মাত্র উমার (রাঃ)-এর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাও দেখি।
বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন

এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে আয়াত : ১-১৪ পাঠ করলেন ।

উমার(রাঃ) বললেন, 'এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সন্ধান বলো।'

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।'

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাড়াতাড়ি নবীজি রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা জানানো করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?'
লোকজনেরা উত্তর দিলেন, 'উমার বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'
হামযাহ (রাঃ) বললেন, 'ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সৎ ইচ্ছা নিয়ে আসে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরের ভেতর অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের কাছে আসেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أَمَا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتّٰى يَنْزِلَ اللهُ بِكَ مِنْ الْخَزِى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ؟)

''উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?'

তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

اللهم هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللهم أَعِزِّ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

''হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।' নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।'

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র ঘরে থাকা লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।[মুখতাসারুস সীরাহ ও সীরাতে ইবনে হিশাম]

উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে কান্না এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল।

সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহবান জানানো সম্ভব হল।

ইবনে মাসউদের বর্ণনাঃ 'যখন হতে উমার (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।'[সহীহুল বুখারীর উমার বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ]

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এতো বেশি সম্মানিত করেছেন যে , জান্নাতে তাঁর জন্য প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছেন।

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :دَخَلْت الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ :لِمَنْ هذَا قَالُوا :لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (মালাইকাগন) বললেন, এ প্রাসাদটি 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু (তিনি সেখানে উপস্থিত 'উমার (রাঃ) এর উদ্দেশে বললেন) তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার ক্ষেত্রেও আমি (উমার) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব? [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭, হাঃ ৫২২৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯৪]

হজরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত : রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি জান্নাতের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবেন।' আবু সাঈদ (রা.) বলেন, 'হজরত উমরের মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তাঁকেই (সে ইঙ্গিতের লক্ষ্যবস্তু) হিসাবে জ্ঞান করতাম। (ইবনু মাজাহ : ৪০৭৭)

৩) হজরত উসমান ইবনে আফফান বিন আবিল আস (রা.)যাকে দেখে মালাইকারা পর্যন্ত লজ্জিত হতো। লাজুকতা যার ভূষণ। দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন। তিনি ছাড়া আর কেউ

কোন নবীর দু'জন কন্যা বিয়ে করেননি। হযরত লূত আলাইহিস সালামের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সপরিবারে হিজরতের মিশন সাফল্যের সাথে সাধন করেছিলেন।

ইতিহাসে কীর্তিমান হওয়া বা কারও কৃতজ্ঞতা লাভ করা যাঁর কোন প্রত্যাশা ছিল না। ইসলামের তৃতীয় খলিফা, যুন-নূরাইন হজরত উসমান ইবনে আফফান বিন আবিল আস (রা.)।

তিনি ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং খলিফা হিসেবে তিনি চারজন খুলাফায়ে রাশিদুনের একজন। উসমান ছিলেন আস-সাবিকুনাল আওয়ালুনের (প্রথমেই ইসলাম গ্রহণকারী) অন্তর্ভুক্ত। অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং খলিফা হিসেবে তিনি চারজন খুলাফায়ে রাশিদুনের একজন। উসমান ছিলেন আস-সাবিকুনাল আওয়ালুনের (প্রথমেই ইসলাম গ্রহণকারী) অন্তর্ভুক্ত একজন। মুসলিম জাহানের তৃতীয় শাসনব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ণধার। ওহীর সংবাদের ভিত্তিতে যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। ছয়জনের অন্যতম যাঁদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত উসমান ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সা. নিজ কন্যা ‘রুকাইয়্যাকে’ তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি ‘যুন-নূরাইন’- দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন।

একটি হাদিস আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় হজরত উসমান ইবনে আফফান বিন আবিল আস (রা.) এর মর্যাদা কতো উচ্চ ছিলো।

উসমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাওহিব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক মিসরবাসী বাইতুল্লাহর হাজ্জ আদায় করে। সে একদল লোককে বসা দেখে বলে, এরা কারা? লোকেরা বলল, এরা কুরাইশ বংশীয়। সে পুনরায় বলে, এই বয়স্ক (শায়খ) লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইবনু উমর (রাযিঃ)। সে সময় সে তার নিকটে এসে বলল, আপনাকে আমি কয়েকটি বিষয় প্রশ্ন করব। অতএব আপনি আমাকে (তা) বলুন।

আমি এ বাইতুল্লাহর মর্যাদার শপথ দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কি অবহিত আছেন যে, উসমান (রাযিঃ) উহুদ যুদ্ধের দিন (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে আবার বলল, আপনি কি জানেন, তিনি (হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত) বাই'আতুর রিযওয়ানে

অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে পুনরায়ও বলল, আপনি কি অবহিত আছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে উপস্থিত হননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল, আল্লাহু আকবার। তারপর ইবনু উমার (রাযিঃ) তাকে বললেন, এবার এসো। যেসব বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছ তা তোমাকে আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেই।

উহুদের দিন তার পলায়নের ঘটনা প্রসঙ্গে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা ইতোমধ্যেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, সম্পূর্ণভাবে মাফ করেছেন। তারপর বদরের যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে (রুকাইয়াহ্) তার সহধর্মিণী ছিলেন (এবং সে সময় তিনি মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যে লোক বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছে তার সমপরিমাণ সাওয়াব ও গানীমাত তুমি পাবে। আর তিনি রুকাইয়ার দেখাশুনা করার জন্য তাকে মদীনাতে থাকারই নির্দেশ দিলেন। আর বাই'আতে রিদওয়ানে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, মক্কাবাসীদের কাছে উসমান (রাযিঃ)-এর চাইতে বেশি মর্যাদাবান কোন মুসলিম লোক (হুদাইবিয়ায়) উপস্থিত থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার পরিবর্তে) তাকেই প্রেরণ করতেন। তা না থাকাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রাযিঃ)-কেই (মক্কায়) প্রেরণ করলেন। আর উসমান (রাযিঃ)-এর মক্কার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর বাই'আতুর রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, (বাই'আতঅনুষ্ঠানকালে)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতের দিকে ইশারা করে বললেনঃ এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তার অন্য হাতের উপর স্থাপন করে বললেনঃ এটি উসমানের (বাই'আত) তারপর ইবনু উমার (রাযিঃ) লোকটিকে বললেন, এবার তুমি এ ব্যাখ্যা সঙ্গে নিয়ে যাও।
[সহীহঃ বুখারী (৯৬৯৮)]

তাঁর খেলাফতকাল এগার বছর এগার মাসের চেয়ে কয়েক দিন বেশি।

৪) ইসলামের চতুর্থ খলিফা, **আসাদুল্লাহিল গালিব হজরত আলী ইবনে আবু তালিব বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)**। ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের অন্যতম। মহানবী (সা.)-এর স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত এই সাহাবি ছিলেন আরবের বিখ্যাত বীর ও সেনাপতি। আল্লাহর রাসূল সা. আপন চাচাতো

ভাইকে নিজের জামাতা বানিয়েছিলেন। নিজের কলিজার টুকরো ফাতিমা রা.-কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল সা. আলী রা.-কে অনেক স্নেহ করতেন। তিনি সাত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবুক ছাড়া সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক পদে নিযুক্ত করে তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সপ্তম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধে যখন মুসলমানরা ইহুদিদের হাতে চরম মার খাচ্ছিল একপর্যায়ে মহানবী (সা.) তাঁর হাতে মুসলিম বাহিনীর ঝাণ্ডা তুলে দেন এবং তার সম্পর্কে বলেন, 'আমি এই ঝাণ্ডা এমন ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেব আল্লাহ যার মাধ্যমে বিজয় দান করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০০৯)

সকালে সবাই রাসুল (সা.)-এর দরবারে হাজির হলো। প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে পতাকা তার হাতে আসবে। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আলী কোথায়?' সবাই বলল, চোখের অসুখের কারণে তিনি পেছনে পড়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তার কাছে লোক পাঠাও।' অতঃপর তাঁকে আনা হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ মুখের লালা হজরত আলী (রা.)-এর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য সুস্থতার দোয়া করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে সুস্থ হলেন যেন এর আগে তাঁর চোখে কোনো অসুখ ছিল না। অতঃপর তাঁর হাতে পতাকা দিয়ে বললেন, 'ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাও ও তাদের মুখোমুখি অবস্থান নাও।' (বুখারি : ৪২১০)।
এ যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :»إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন: 'আলী আমার হতে আর আমি 'আলী হতে। আর সে প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু। অর্থাৎ আমরা পরস্পরে অভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।
[সহীহ: তিরমিযী ৩৭১২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২২২৩, সহীহুল জামি ৫৫৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৮১৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৫৮১৭]

আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ ওসিয়াত করেন যে, মুমিনরাই তোমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই তোমার

প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। আদী ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগের জন্য দু'আ করেছেন, আমি সে যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। **[সহীহঃ ইবনু মাজাহ (১১৪), মুসলিম।]** (আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।)

৫) হজরত তলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বিন উসমান বিন উমর (রা.)। তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (আরবি: طلحة بن عبيدالله) (মৃত্যু ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম আটজন ব্যক্তির অন্যতম। তিনি মুহাম্মদ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবি ছিলেন। উহুদের যুদ্ধ ও উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি অধিক পরিচিত। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তালহা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু বকরের আহ্বানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একবার ব্যবসা করতে সিরিয়া যান। সেখানে বাজারের মধ্যে এক খ্রিস্টান ধর্ম যাজক তাকে আরবের নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ধর্মযাজকের মুখে মুহাম্মদের নাম শুনে তালহা বিস্মিত হয়ে যান। তিনি মক্কায় ফিরে জানতে পারেন আবু বকর নবী মুহাম্মদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাই বিস্তারিত জানতে তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান। আবু বকরের কাছ ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থতম। উহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে অত্যন্ত মজবুতভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। চব্বিশ স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন। তখন নবী (স.) তার নাম রেখেছিলেন তলহাতুল খায়র। তিনি জামাল যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। [আসহাবে রাসূলের জীবনকথা]

তালহার মা চেয়েছিলেন তার পুত্র গোত্রের নেতা হোক। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তালহা গোত্রীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি খুব কষ্ট পেলেন এবং তালহাকে নানা ভাবে ইসলাম ত্যাগ করতে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু তালহা কিছুতেই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেন না। এরপর শুরু হলো তার ওপর অকথ্য নির্যাতন। তাকে ও আবু বকরকে এক রশিতে বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছিলো। তাই তাদের দুইজনকে একত্রে "কারীনাইন" বলা হয়। [আসহাবে রাসূলের জীবনকথা]

হিজরি তৃতীয় সনে মক্কার অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সংঘটিত হয় ওহুদ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। যুদ্ধের একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তখন অল্প কজন সৈনিক আল্লাহর রাসুল (সা.)–কে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। হজরত তালহা (রা.) তাঁদের অন্যতম।

ওহুদ যুদ্ধে রাসুল (সা.) আহত হন। তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হয়। সে সময় তালহা (রা.) ছুটে এসে আহত রাসুল (সা.)-কে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে রেখে আবার শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আবু বকর (রা.) আর আবু উবাইদা (রা.) রাসুল (সা.)–এর সেবা করতে এলে তিনি তাঁদের বললেন, আমাকে ছেড়ে তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো। হজরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, 'আমরা তাকিয়ে দেখি, তালহা (রা.) রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়। সারা শরীরে তির আর বর্শার সত্তরটিরও বেশি আঘাত।' হজরত আবু বকর (রা.) ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, 'সে দিনের সবটুকুই তালহার!'

ওমর (রা.) তালহা (রা.)–কে 'সাহেবে ওহুদ' (ওহুদওয়ালা) বলে ডাকতেন। এ যুদ্ধেই হজরত তালহা (রা.)–র অসাধারণ ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

কায়েস ইবনে আবু হাজেম (রা.) বলেন, 'আমি দেখেছি, সেদিন আঘাতের কারণে তালহার হাত অবশ ও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সে হাত দিয়েই নবী (সা.)-কে রক্ষা করেছিলেন। কী যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন তালহা (রা.)।'[বুখারি, হাদিস: ৩,৭৬০]

ওহুদ যুদ্ধে তালহা (রা.)–র বীরত্ব ও সাহসের নজিরবিহীন অবদানের জন্য রাসুল (সা.) বলেছিলেন, 'যদি কেউ কোনো শাহাদাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।'

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) একজন জীবন্ত শহীদের নাম। বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারেননি। কারণ, মদিনার মুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণ হতে পারে, এ আশঙ্কায় রাসুল (সা.)–এর আদেশে তাঁকে মদিনায় থাকতে হয়েছিল। তবে তাঁকে 'বদরি সাহাবি' হিসেবেই গণ্য করা হয়। কেননা, সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার, মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের সূচনাপর্বে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইসলামের ছায়াতলে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। [আসহাবে রাসূলের জীবনকথা]

৬) জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) (আরবি: الزبير بن العوام; ৫৯৪–৬৫৬) ইসলামের প্রথম যুগের একজন মুসলমান যিনি ইসলামের রাসুল মুহাম্মাদের একজন সাহাবী ছিলেন। জুবাইর ইবনুল আওয়ামের মূল নাম জুবাইর এবং ডাক নাম আবু আবদিল্লাহ। তার উপাধি ছিল হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ। যুবাইর হিজরতের ২৮ বছর পুর্বে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লাহর রাহে সর্ব প্রথম তরবারি ধারণকারী হজরত জুবাইর ইবনে আওয়াম বিন খুয়াইলিদ (রা.)। সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর রাহে তরবারি চালিয়েছিলেন। তার আকৃতিতে ফেরেশতাগণ বদর যুদ্ধে অবতরণ করেছিলেন। তিনি জামাল যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

জুবাইর ইবনুল আওয়াম ইসলামের রাসুল মুহাম্মাদ প্রিয় পাত্র ছিলেন। মুহাম্মাদ তাকে মুরীদ (হাওয়ারি) হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি অকুতোভয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি মুহাম্মদ-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। [তিরমিজি হাদিস ৩৭৪৭]

৭) ইসলামের সব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী **হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বিন আব্দুল হারিস (রা.)**। হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন। সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা হাবশা ও মদিনায় দুই জায়গাতেই হিজরত করেছিলেন, তাঁদের বলা হয় 'সাহিবুল হিজরাতাইন'। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন সাহিবুল হিজরাতাইনের একজন। হাবশা থেকে পরে তিনি ফিরে আসেন মক্কায়। তারপর হিজরত করেন মদিনায়।

মদিনায় হিজরতের কিছুদিন পর তিনি এক আনসারি নারীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর একদিন তিনি রাসুল (সা.)–এর খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?
'

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ।'

রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়েতে মোহর কত নির্ধারণ করেছ?'

তিনি বললেন, 'কিছু সোনা।'

রাসুল (সা.) বললেন, 'একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।' [বোখারি, হাদিস নং : ২০৪৯]
রাসুল (সা.)–এর নির্দেশে তিনি ওয়ালিমার দায়িত্ব সেরে নেন।

প্রথম দিকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাসুল (সা.) তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন এবং সে দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। যার ফলে তিনি একসময় অঢেল সম্পদের মালিক হন। তবে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে পারেনি। তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর পথেই দান-সদকা করতে বেশি ভালোবাসতেন।

নবীজি (সা.)-এর জীবদ্দশায় একবার তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদের অর্ধেক সদকা করে দেন। এরপর ৪০ হাজার দিনার সদকা করেন। এরপর ৫০০ ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দেন। এরপর ৫০০ উট। এসব তাঁর ব্যবসায় অর্জিত সম্পদ। কথিত আছে যে এক দিনেই তিনি ৩০টি গোলাম মুক্ত করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি বদরি সাহাবিদের জন্য জনপ্রতি ৪০০ দিনারের অসিয়ত করে যান। তখন ১০০ বদরি সাহাবি জীবিত ছিলেন। সবাই ৪০০ দিনার করে লাভ করেছেন। (আল-ইসাবাহ : ৪/২৯১, ২৯৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৬৩)

একবার তাঁর বিশাল এক বাণিজ্য কাফেলা ৭০০ উট বোঝাই করা ছোলা, আটা ও অন্য মুদিসামগ্রী নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করে। বিশাল এই বাণিজ্য কাফেলা মদিনাজুড়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই খবর আয়েশা (রা.)-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবদুর রহমান এ কথা শোনামাত্রই আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, আমি আপনাকে সাক্ষ্য করে বলছি, আমার এ বিশাল বাণিজ্য কাফেলা এবং সব পণ্য, এমনকি উট ও তার হাওদাসহ সব কিছুই মহান আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৬৪)

আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম (ধনী হিসেবে) জান্নাতে প্রবেশ করবেন আবদুর রহমান বিন আউফ। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ' [মুসনাদে বাজ্জার : ৭০০৩]

ইবনে হাজার (রহ.) আল-ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) মোট ৩০ হাজার দাস মুক্ত করেছেন। আল্লাহর রাস্তায় ৪০ হাজার দিনার, ৫০০ ঘোড়া এবং ৫০০ বাহন দান করেছেন। [উসদুল গাবাহ]

অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। সম্পদের ব্যাপারে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। সাদ ইবনে ইবরাহিম তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আবদুর রহমান বিন আউফ সিয়াম পালন করছিলেন। ইফতারের সময় তার সামনে ভালো মানের খাবার পরিবেশ করা হলো। এ খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুসআব ইবনে উমায়ের ছিলেন আমার থেকে উত্তম মানুষ। তিনি শহীদ হলে তার জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। এখন আল্লাহ আমাদের জন্য দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করেছেন। আমার ভয় হয়, না জানি আমাদের বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ' অতঃপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর খাবার গ্রহণ করেননি। (উসদুল গাবাহ)।

আরেকবার তার সামনে গোশত ও রুটি পেশ করা হলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। এরপর বলেন, 'প্রিয়তম রাসুল (সা.) এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন যে, তিনি এবং তার পরিবার যবের রুটি পেটপুরে খেতে পারেননি। জানি না, আমাদের উত্তম জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কিনা। ' [ইতহাফ : ৭৩৪২]

ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগের জন্য যাঁরা পৃথিবীর জীবনেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) অন্যতম। যৌবনের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে তিনি ইসলাম প্রচারে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।
ইবনে সাদ (রহ.)-এর বর্ণনামতে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ৭৫ বছর বয়সে, আর ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর বর্ণনামতে ৭২ বছর বয়সে ৩২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদিনার জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

৮) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবির মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি হলেন, **সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)**। ৫৫ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)। হিজরতের ২৩ বছর আগে ৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে কোরাইশের বনু যোহরা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা হামনা। যেহেতু তাঁর নানীর বংশ নবীজির বংশপরম্পরায় যোহরা বংশে ছিল, সে হিসেবে নবীজি (সা.) তাঁর মামা হন। নবীজি (সা.) অনেকবার নিজেও এই আত্মীয়তার কথা স্বীকার করেছেন।
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি তিনি। ইসলামের সূচনালগ্নে তৃতীয় বা চতুর্থ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। । ইসলামের সব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী। উহুদ যুদ্ধে তাঁকে রাসুলুল্লাহ

(স.) বলেছিলেন, তোমার উপর আমার মা-বাবা কোরবান হোক, তীর নিক্ষেপ করো। তিনি সকল যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। ঈমানকে মায়ের ভালোবাসার উপর অগ্রাধিকার দিলেন। অটল থাকলেন ইসলামের ওপর। মাকে লক্ষ করে বললেন, মা আমার! আপনার যদি হাজারটা প্রাণ থাকে। আর হাজারবার এ ধরনের কসম করেন, তারপরেও আমি আমার ধর্ম থেকে ফিরে আসতে পারব না। আল্লাহপাক খুশি হয়ে তাঁর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন, 'যদি তারা আমার সাথে এমন বিষয়ের শরিক করার জন্য বল প্রয়োগ করে যার তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে সাহচর্য অবলম্বন কর।' [সূরা লুকমান, আয়াত : ১৫]

তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামে তীর নিক্ষেপ করেন। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে রাসূল (সা.) কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য ৬০জন সাহাবির একটি টহলদল হিজাযের উপকলীয় নগরীতে পাঠান। সাদ (রা.) ছিলেন এ টিমের অন্যতম সদস্য। এ টহলদল ইকরিমা বিন আবু জাহেলের নেতৃত্বে কোরাইশদের একটি কাফেলাকে দেখতে পান। কোরাইশদের কেউ চিৎকার করে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে হজরত সাদ (রা.) তীর নিক্ষেপ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানের ছোড়া প্রথম তীর। [হায়াতুস সাহাবী]

৯) হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ ইবনে উমর বিন নুফাইল (রা.)। উমর (রা.)-এর চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি সাঈদ (রা.)। তিনি জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ও ফাতিমা বিনতে বাজাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে খুওয়াইলিদের সন্তান। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার একজন। তাঁর জন্ম হিজরতের ২২ বছর আগে।
[আল-আলাম, জিরিকলি : ৩/৯৪]
বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

১০) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবি। তিনি 'আমওয়াস' মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ১৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি জর্দানে অবস্থান করছিলেন এবং তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। [উসদুল গাবাহ : ৬/২০১]
হজরত আবু উবাইদাহ আমের ইবনে আবদুল্লাহ বিন জাররাহ (রা.)। সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
তাঁর মূল নাম আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।
কিন্তু তিনি উপনাম 'আবু উবায়দা' নামেই বেশি পরিচিত। দাদার নামের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে বলা হয় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। তিনি ইসলামগ্রহণে অগ্রগামীদের একজন

ছিলেন এবং হাবশা ও মদিনায় দুবার হিজরত করেন। তিনি নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । তিনি ওহুদ যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর চোয়ালে বিঁধে যাওয়া লৌহবর্ম দাঁত দ্বারা উত্তোলনকারী। এবং উহুদের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাথায় শিরস্ত্রাণের কড়া ঢুকে গেলে তিনি তা দাঁত দিয়ে উঠানোর চেষ্টা করলে তখন তার সামনের দুই দাঁত পড়ে গিয়েছিল। (সূত্র: উসদুল গাবাহ, আলমুজতবা মিনাল মুজতবা পৃ. ৪১-৪৪; জামে তিরমিজি: ২/২১৫: ৩৯৯৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-ও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক (রা.) বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, সাহাবিদের মধ্যে নবীজি (সা.)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বকর (রা.)।
আমি বললাম এরপর? তিনি বলেন, ওমর (রা.)। আমি বললাম তাঁর পরে? তিনি বলেন, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৫৭)

আবু উবায়দা (রা.)-এর ব্যাপারে নবীজি (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক জাতির একজন 'আমিন' (বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল ব্যক্তি) রয়েছে, এই উম্মতের আমিন হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৩৮২)

উল্লেখ্য, অনেকে মনে করেন শুধু উপরোক্ত ১০ সাহাবি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। এই ধারণাটি ভুল। বরং অসংখ্য সাহাবিকে নবীজি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই ১০ জন ছাড়া আরো যাঁদের রাসুল (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন **হাসান ইবনু আলী (রা.), হুসাইন ইবনু আলী (রা.)** ।

যেমন হাদিসে এসেছে, নবীজির নাতী হাসান-হুসাইন (রা.) জান্নাতের যুবকদের সরদার হবেন এবং তাঁদের মা নবী কন্যা **ফাতেমা (রা.)** জান্নাতের নারীদের সরদার হবেন। (জামে তিরমিজি: ৩৭৮১)

বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি হলেন, **আবুল ইয়াসার কাআব ইবনে ওমর আল আনসারি (রা.)**। তিনি ৫৫ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

এছাড়াও একদিন জিব্রাইল (আ.) নবীজির কাছে এসে হজরত **খাদিজা(রা.)** এর জন্য জান্নাতে মুক্তা-প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি: ৩৮২০)।

এ ছাড়া **হামজা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রা.)**। মুসতাদরাকে হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন, সাইয়িদুশ শুহাদা হলেন হামজা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব। সুতরাং শহীদরা যদি জান্নাতি হন তাহলে তাঁদের নেতাও জান্নাতি হবেন।

বদর যুদ্ধের **শহিদ হারেসা ইবনে সুরাকা (রা.)**-এর ব্যাপারে নবীজি জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি: ৩৯৮২)।

জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **জাফর ইবনু আবি তালেব (রা.)**। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি জান্নাতে জাফর ইবনু আবি তালিব (রা.)-কে ফেরেশতাদের সঙ্গে পাখির মতো উড়তে দেখেছি।' (জামে সগির, হাদিস : ৪৩৬৭)

বেলাল (রা.)-এর ঘটনাও অনেকেই জানেন যে, জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)**। বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন ভোরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিলাল (রা.)-কে ডেকে বলেন, হে বিলাল! তুমি জান্নাতে কী কারণে আমার আগে আগে থাকছ? যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি সে সময়ই আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। গত রাতেও আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। [সহিহ মুসলিম: ২৪৫৮]।

তারপর বিলাল (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কখনো আমি আজান দিলেই দুই রাকাত নামাজ আদায় করি এবং কখনো আমার অজু ছুটে গেলেই আমি অজু করি এবং মনে করি, আল্লাহ তাআলার নামে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা আমার কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ দুটি কারণেই (তোমার এ মর্যাদা)। [তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৮৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর একবার নবীজি তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, 'নিশ্চয় সে জান্নাতে'। [সহিহ মুসলিম: ২৪৮৩]

বায়আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি হলেন, **জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারি (রা.)**। তিনি ৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

দুই কিবলায় নামাজ আদায়কারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবি হলেন **আব্দুলল্লাহ ইবনে বুসর আল মাজিনি (রা.)**। তিনি ৮৮ হিজরিতে শামে ইন্তেকাল করেন।

জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **ইয়াসার (রা.)-এর পরিবার—সুমাইয়া (রা.), ইয়াসার (রা.), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা.)**-এর ওপর কাফিরদের নির্যাতন দেখে রাসুল (সা.) তাঁদের বলেছিলেন, ধৈর্য ধরো হে ইয়াসারের পরিবার, তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা আছে। [ইবনু আবিদ দুনিয়া, কিতাবুস সবর]

জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **বায়াতে রিদাওয়ানের শপথকারী সাহাবিরা।**

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। যেসব মুমিন হুদায়বিয়ার দিন গাছের নিচে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। তাঁদের সংখ্যা এক হাজার ৪০০ ।

বায়আতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবি হলেন, **ওমর ইবনে হুরাইস (রা.)**। তিনি ৮৫ হিজরিতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

জাবের (রা.) বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমাদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীদের মধ্যে উত্তম মানুষ।' [বুখারি, হাদিস : ৪১৫৪]

রাসুল (সা.) আরো বলেন, 'যারা গাছের নিচে বাইয়াত করেছে তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৬০)

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদিস থেকে আরো কিছু সাহাবির ব্যাপারে রাসুল (সা.) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে আছেন **আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), সাবিত ইবনু কুয়াইস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.), উকাসা ইবনে মুহসিন (রা.)**সহ আরো অনেকে।

যে সাহাবিরা নবীজি (সা.)-এর সর্বোচ্চসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে মদিনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবি হলেন, **সাহাল ইবনে সাআদ আস সায়েদি (রা.)**। তিনি ৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

যেসব সাহাবি সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবি হলেন, **আনাস ইবনে মালেক আল আনসারি (রা.)**। তিনি নবীজি (সা.)-এর সেবক ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরিতে বসরায় ইন্তেকাল করেন।

সাহাবিদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন তিনি হলেন, **আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা আল লাইহি (রা.)।** তিনি **১১০** হিজরিতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

নারীদের মধ্যে অনেক সাহাবিকে রাসুল (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন **খাদিজা (রা.)**। (বুখারি, হাদিস : ৩৮১৬)

জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **বদরি সাহাবিরা।** ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ বদরের প্রান্তরে ৩১৩ জন সাহাবি অংশগ্রহণ করেছেন। বদরি সাহাবিদের সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, যারা বদর ও হুদায়বিতে অংশগ্রহণ করেছে তারা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

জান্নাতিদের তালিকায় আছেন **ফাতেমা (রা.)**। উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা (রা.)-কে বলেন, তুমি মারইয়াম বিনতু ইমরান ছাড়া জান্নাতের নারীদের নেত্রী হবে। তখন তিনি আনন্দে হেসে রাসুল (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ আরো যাঁদের দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন **আয়েশা (রা.)**। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, জিবরাইল (আ.) একটি সবুজ রঙের রেশমি কাপড়ে তাঁর [আয়েশা (রা.)] প্রতিচ্ছবি নবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে এসে বলেন, ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী। (বুখারি, হাদিস : ৫১২৫)

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদিস থেকে আরো কিছু নারী সাহাবির ব্যাপারে রাসুল (সা.) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে আছেন **একজন কালো নারী**, যিনি মসজিদে নববীর খাদেম ছিলেন, রাসুল (সা.) তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।উঠেছিলেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৯৩)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জাহান্নামের আগুন এমন মুসলিমকে স্পর্শ করবে না যে আমাকে দেখেছে (অর্থাৎ সাহাবি), অথবা আমাকে যারা দেখেছে তাদের সে দেখেছে (অর্থাৎ তাবেয়ি)। [তিরমিজি: ৩৮৫৮]

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সাহাবাগণের জীবন থেকে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের তাওফিক দান করুন।
ইন শা আল্লাহ এবার আমরা জানব কুরআন ও হাদিসে সাহাবিদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে।

ইসলামে নারী সাহাবাদের মর্যাদা

নারী সাহাবিদের নিয়ে খুবই কম আলোচনা করা হয়েছে ইতিহাসে। অথচ উনাদের মর্যাদা অতুলনীয়। ইসলামের সোনালি ইতিহাস রচনায় যেসব নারীর আত্মত্যাগ সবচেয়ে বেশি, তাঁরাও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, আমাদের পথের দিশারি। তাঁদের মাঝে আছেন-

★ **হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)**

মুসলিম সমাজের নারীদের আদর্শ হিসাবে সর্বপ্রথম যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন এমন একজন মহায়সী নারী যার কাছে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আল আমীন সালাম পর্যন্ত পৌঁছাতেন। আর তিনি হচ্ছেন **হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)**।

খাদিজা(রাঃ) পুরো নাম হচ্ছে খাদিজা বিনতে খাওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আব্দেল ওজ্জা ইবনে কুসাই। খাদিজা (রা.) ৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতেমা। তাঁরা উভয়ে কুরাইশ বংশের ছিলেন। (সীরাত বিশ্বকোষ : ২:৩০৮)

পিতা খুওয়াইলিদ ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাধে তিনিও খুব সহজে ব্যবসায় থিতু হন।

তৎকালীন মক্কার নামকরা ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের নাম নিলেই উচ্চারিত হতো খাদিজার নাম। তিনি নিজে ব্যাবসায়িক কাজে কোথাও যেতেন না। ব্যবসার কাজে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট লভ্যাংশের শর্তে বিচক্ষণ লোকদের নিয়োগ দিতেন। তাদের দ্বারাই ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অর্থনীতিতে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার যুগের সবচেয়ে ধণাঢ্য ব্যক্তি ও দৃষ্টান্তহীন করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ইসলামের পথে তার সমস্ত ধন-সম্পদকে ব্যয় করেছেন।

ইসলামের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য খাদিজা রা. এর সম্পদ ছিল অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যক। নবীজির সাত সন্তানের মধ্যে ইবরাহিম ছাড়া কাসেম, তাহের, জয়নাব, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়্যা ও ফাতিমা খাদিজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি নবীজির কাছে এতটাই প্রিয় ছিলেন যে তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি আর কাউকে বিবাহ করেননি। একবার আয়েশা (রা.) তাঁর ব্যাপারে কিছু বললে, নবীজি (সা.) তাঁকে ধমক দিয়ে সতর্ক করেন। হাদিসে এসেছে, নবীজি (সা.) বলেন, 'খাদিজা এ যুগের শ্রেষ্ঠ নারী।'

[বুখারি, হাদিস : ৩৪৩]

তিনি দেখিয়েছেন স্বামী সেবা করে কি ভাবে সুখী হওয়া যায়। অথচ নবীজির বয়স ছিল উনার চাইতে প্রায় অর্ধেক। তিনি ছিলেন বিত্তশালী ব্যবসায়ী এবং বিধাবা। এমন এক দুঃসময়ে তিনি রাসুল্লাহ (সঃ) এর জীবন সঙ্গীনি হয়েছিলেন যখন বিশ্ব নবী ছিলেন চিন্তাক্লিষ্ট, অসহায়, বিপদগ্রস্থ ,অভাবে জর্জরিত ও শত্রুকূল দ্বারা পরিবেষ্টিত। চারিদিকে তাঁকে তিরষ্কার করা

হচ্ছে। এমন কি আপন পরিজন এবং স্বজনরাও তাহাকে হত্যা করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। আশা নিরাশার চরম সন্ধিক্ষণে যখন বিশ্বনবীর সাধনার তরী অথৈ জলে ভাসছিল ঠিক তখনি হযরত খাদিজাতুল কোবরা তাঁর হাত ধরলেন। তিনি বিশ্বের নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে গেলেন। নিজের সম্পূর্ন সত্তাকে পরিপূর্ণরুপে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সেবা যত্ন ও ভালোবাসার সাগরে বিলিন করে দিয়েছিলেন।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা ২৫ বছর রাসূল(সা.)-এর সাথে জীবন-যাপন করেন এবং তার মধ্যে ১০ বছর ছিল রাসূল(সা.)-এর নবুয়ত লাভের পর।

তিনিই প্রথম নারী ছিলেন যিনি ইসলামের উদয়ান্তে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ২৫ বছর যাবত রাসূলের (সা.) সাথে যুগল জীবন যাপন করেন। এই দিনগুলিতে সর্বদা পরাক্রান্ত ও আত্মত্যাগী সাথী, দয়াশীল বন্ধু হিসেবে রাসূলের (সা.) সাথে ছিলেন।

ইসলাম ধর্মে খাদিজার মর্যাদা অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে অনেক উপরে। তিনি প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি।একটি হাদিসে মুহাম্মাদ বলেছেন, "পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম নারী মরিয়ম বিনতে ইমরান ও খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ।"[আসহাবে সাহাবার জীবন কথা]

খাদিজা ছিলেন মুহাম্মাদের সাথে প্রথম নামায আদায়কারী ব্যক্তি।[হায়াতুস সাহাবা]

আফীক আলা-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য একবার মক্কায় এসেছিলেন। আব্বাসের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তিনি। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি দেখে আফীক আব্বাসকে বললেন, 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'হ্যাঁ, এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী। আমার জানামতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।[তাবাকাত]

বুখারি শরিফে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল একবার মুহাম্মাদকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! দেখুন খাদিজা আসছেন। তিনি আপনার নিকট আসলে আপনি তাঁকে আল্লাহর সালাম জানাবেন এবং তাকে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বেহেশতী মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। সেই মহলে কোন অযথা শোরগোল থাকবে না এবং ক্লান্তি ও অবসন্নতাও কাওকে গ্রাস করবে না।"[সহীহ বুখারী -তাজবিজুন নাবী অধ্যায়--১ম খন্ড, পৃঃ ৫৩৮]

খাদীজা রা. এর ইনতিকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়েন। কতই না ধৈর্যশীলা ও নিষ্ঠাবতী ছিলেন তিনি। সর্বদা প্রীতি-ভালোবাসায় বিমুগ্ধ রাখতেন সাসূলকে। দাম্পত্যে পুরোটা সময় দ্বীনের তরে অকাতরে বিলিয়ে অমর হয়ে আছেন

তিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কী করে ভুলতে পারেন! তাঁর সম্পর্কে তিনি যে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন, তা কি আমাদের কলম যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম?

‘আলী (রাঃ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রাঃ)। [বুখারী:৩৪৩২]

. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে সব সময় হযরত খাদীজা রা. এর স্তুতিবানী ও প্রশংসাবাক্য শুনে তাঁকে ভীষণ ঈর্ষা করতেন উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা রা. । আর এটা হতো রাসূলকে তাঁর ভালবাসার আধিক্যের কারণে।

আয়িশাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, নবীর সহধর্মিণীদের কারো উপর আমি এত ঈর্ষান্বিত হইনি যতটুকু ঈর্ষা করেছি খাদীজার উপর। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেশি স্মরণ করতো। অথচ আমি তাঁকে কক্ষনো দেখিনি আমার বিয়ের তিন বছর আগেই তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। কেননা আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর আলোচনা করতে শুনতাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ করেছিলেন যে, আপনি জান্নাতে খাদীজাহকে একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি গৃহের সুখবর দিন আর তিনি বকরী যাবাহ করলে খাদীজার বান্ধবীদের গোশত উপঢৌকন দিতেন।

একদা আমি তাকে রাগিয়ে দিলাম এবং বললাম, খাদীজাহকে এতই ভালবাসেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেনঃ তাঁর ভালবাসা আমার মনে জায়গা করে নিয়েছে। [সহীহ মুসলিম: ২৪৩৫]

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতার বিষয়ে নিচের কথাগুলো বলা যায়,

♣ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম হযরত খাদীজাকেই বিয়ে করেন।

♣ উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে তিনিই প্রথম ঈমান আনয়নকারী

♣ প্রথম তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একসাথে নামায পড়েন।

♣ প্রথম তাঁর গর্ভেই রাসূলের সন্তান জন্ম নেয়।

♣ রাসূলের সহধর্মিণীগণের মধ্যে তাঁকেই প্রথম জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

♣ প্রথম তাকেই আল্লাহ তা’আলা সালাম পৌছান।

♣ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাসুলের সাহায্যকারী হিসেবে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

♣ মক্কায় তাকেই প্রথম রাসূলুল্লাহ নিজ হাতে কবরে দাফন করেন।

♣ তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রাসূল (সাঃ) তাকে বারবার স্মরণ করেছেন।.

যখন তাওহীদের বাণী প্রচারের এক চরম কঠিন মুহূর্ত ছিল, তখন খাদীজা রা. এর মতো বিশ্বস্ত, খেদমতকারিণী, বুদ্ধিমতি, বিচক্ষণ, দুঃসাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না একজন জীবনসঙ্গিনীর বিয়োগ ব্যথা কত বড় শোক ও বেদনার, উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে তা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত বিশ্ববাসীকে এমনই উদারতা ও বদান্যতার সৌন্দর্য বিলানো, ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার সৌরভ ছড়ানো ফুলের মত জীবন উপহার দিয়ে গেছেন আমাদের এই উম্মুল মুমিনীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, রাসূলের অতুলনীয়া সহধর্মিনী। [মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন]

দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস যুগিয়ে, অভাব-অনটনে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনাকালে অকুণ্ঠ সহমর্মিতা দিয়ে, নতুনের শিহরণে ভীত-চকিত রাসূলকে অনন্য সাধারণ প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে, অতুলনীয় প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে রাসূল (সা)-এর জীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জীবন্ত নে‘মত স্বরূপ। তিনি ছিলেন শেষ সন্তান ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (সাঃ)-এর সকল সন্তানের মা। তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

‘জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ’লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম’। [আহমাদ হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/৬১৮১]

নবীজি স্নেহশীল চাচা আবু ত্বালিবের মৃত্যুর অনধিক তিন মাস পরে দশম নববী বর্ষের রমাদন মাসে প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)এর মৃত্যু হয় (আর-রাহীক্ব ১১৬ পৃঃ)। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর তিন দিন পরে খাদীজার মৃত্যু হয় (যাদুল মা‘আদ ৩/২৮)।

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

★ উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এর মর্যাদা ও সন্মানঃ

আয়েশা (রা.), ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)- এর কন্যা আম্মাজান আয়েশা (রা.) ছিলেন প্রিয় নবীর সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী , নবুয়তের চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। মূল নাম আয়েশা। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা ও হুমায়রা। অত্যধিক সুন্দরী

হওয়ায় তাঁকে হুমায়রা বলা হতো। পরবর্তী সময়ে নবী করিম (সা.)-এর স্ত্রী হওয়ায় উম্মুল মুমিনিন বা মুমিনদের মা উপাধি ধারণ করেন। পিতার নাম আবু বকর সিদ্দিক আবদুল্লাহ বিন আবু কুহাফা তাইমি কুরাইশি (রা.)। রাসুল (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সহচর ও বন্ধু।
মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকালে রাসুল (সা.)-এর দেহরক্ষী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। কুরাইশের তাইম গোত্রের সদস্য ছিলেন। আয়েশা (রা.) নিঃসন্তান ছিলেন।
একবার তিনি রাসুল (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার সঙ্গিনীদের বিভিন্ন উপনাম আছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'আয়েশা, তোমার সন্তান আবদুল্লাহর নামে উপনাম (কুনিয়াত) গ্রহণ করো।' অর্থাৎ আয়েশার বোন আসমা (রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর নামে। এর পর থেকে তিনি 'উম্মে আবদুল্লাহ' নামেই পরিচিতি লাভ করেন। [আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৭০]
হিজরতের প্রায় ১০ মাস আগে রাসুল (সা.) আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা.) ছিলেন খাদিজা (রা.)-এর পর রাসুল (সা.)-এর প্রিয়তম স্ত্রী। রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনি ছিলেন কুমারী।
আয়েশা (রা.) নারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া বিচক্ষণতা ও সাহসিকতায়ও অনন্যা ছিলেন তিনি।
হযরত আয়েশা (রা) এর সীরাতের প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় তখন কেবল সকল মহিলা সাহাবা নয় বরং অনেক বড় বড় পুরুষ সাহাবিদের তুলনায় তাঁর যে অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলঃ

১] দ্বীনের তাৎপর্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান।

২] ইজতিহাদির ক্ষমতা ও শক্তি

৩] আলোচনা ও পর্যালোচনার রীতি-পদ্ধতি

৪] গভীর অন্তর্দৃষ্ট

৫] প্রয়োজনীয় মতামত প্রকাশের ক্ষমতা।

আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, 'আমরা রাসুলের সাহাবিরা কোনো হাদিস নিয়ে সমস্যায় পড়লে আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতাম। তাঁর কাছ থেকে তখন নতুন জ্ঞান লাভ করতাম।'
মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়, 'আয়েশা (রা.) থেকে শরিয়তের এক-চতুর্থাংশ বিধি-বিধান বর্ণিত আছে। বড় বড় সাহাবিরা যেকোনো সমাধানের জন্য আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসতেন।'
প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা বিন রাবাহ (রহ.) বলেন, 'আয়েশা (রা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর মতামতের অধিকারী।' ফিকহ, চিকিৎসা, কবিতাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রসুল (সাঃ)- আয়েশা (রা.) কে যে কতটুকু অগ্রাধিকার তা আমরা সুরা আহযাবের ২৮ নাম্বার আয়াত তথে বুঝতে পারি আলহামদুলিল্লা-

ইমাম মুসলিম (রহ.) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা প্রদানের আয়াত নাযিল করলেন, তখন প্রথমে আয়েশা (রা) থেকে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলছি, যে বিষয়ে তুমি তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ না করে কোনো উত্তর দেবে না। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"অর্থাৎ হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও যে, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং সম্মানের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই।"

[সূরা আহযাব: আয়াত-২৮]

অতঃপর আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যাপারে আর কি পরামর্শ করব । আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই অগ্রাধিকার দেই।

হযরত আয়েশা (রা) বলতেন আমি গর্বের জন্য নয় , বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কাউকে দান করেননি।

- ফেরেশতা রাসুলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দেখিয়েছেন,
- আমার সাত বছর বয়সে রাসুল (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন,
- নয় বছর বয়সে আমি স্বামী গৃহে গমন করেছি,
- রাসুল (সা.) আমাকে ছাড়া কাউকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেননি।
- রাসুলের সঙ্গে কম্বলের নিচে থাকা অবস্থায় ওহি অবতীর্ণ হয়,
- আমি ছিলাম রাসুল সা এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী,
- আমার নির্দোষতা ঘোষণা করে কোরআনে আয়াত নাযীল হয়েছে
- জীবরিল (আঃ) কে আমি স্বচক্ষে দেখেছি,
- উত্তম মানুষের কাছে আমি উত্তম হয়ে গড়ে উঠেছি। আমাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিকের আশ্বাস দেওয়া হয়।
- আসমান থেকে আমার পবিত্রতার ঘোষণা আসে।
- রাসুল সা আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন,
- আমি তার খলিফা ও তার সিদ্দিকের কন্যা

- ❖ রাসুলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ মুহুর্তে আমার মুখের লালা তার মুখের লালার সাথে মিলেছে,
- ❖ আমার ঘরেই তাঁর কবর দেয়া হয়েছে। [সিয়ারু আলাম আন-নুবালা ৩/১৪০-১৪১]

প্রিয় নবীজির কাছে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন খাদিজা (রাঃ) এর পরে সবচেয়ে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গী।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'আমাকে স্বপ্নে তোমাকে দেখানো হয়। একজন ফেরেশতা রেশমের টুকরোতে করে তোমাকে নিয়ে আসে। তিনি বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। অতঃপর আমি চেহারা খুলে তোমাকে দেখতে পাই। আমি বললাম, ইনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে তা যেন অবধারিত হয়।'

একবার আমর বিন আস (রা.) রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন, তাঁর বাবা।...'। (বুখারি, হাদিস : ৩৬৬২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন। প্রিয়তমা স্ত্রীকে 'হুমায়রা' উপাধিতে ডাকতেন। সাহাবিদের সঙ্গে তাঁর প্রতি ভালোবাসার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) তাঁকে 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধের সেনানায়ক করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন, আয়েশা (রা.)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আয়েশার পিতা (আবু বকর রা.)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন লোকটি! তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। তারপর আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।'

[বুখারি, হাদিস : ৩৪০০]

দাম্পত্য জীবনে আয়েশা (রা.)-এর ওপর অপবাদ লাগানোর ঘটনাটি ছিল দুঃখজনক। এটা তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কঠিন পরীক্ষা হিসেবে আসে। কিছু মুনাফিক আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিল। আল্লাহ তাআলা আয়েশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা ঘোষণা করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি।

(সুরা : নুর, আয়াত : ১১)
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয়তমার উন্নত চরিত্রের সার্টিফিকেট পেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আরো বেশি স্নেহ ও সম্মান করতেন।
আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতা অর্জন করেছেন। তবে নারীদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করেছেন কেবল মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। আর সব খাবারের মধ্যে সারিদ যেমন, তেমনি সব নারীদের মধ্যে আয়েশা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।' [বুখারি, হাদিস : ৩৪১১]
আয়েশা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমজান রাতে মৃত্যুবরণ করেন। আবু হুরায়রা (রা.) জানাজার নামাজ পড়ান। মদিনার জান্নাতুল বাকিতে রাতে দাফন করা হয়।

★ নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ (রা.)ঃ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত শুরু করার সময় থেকে প্রাথমিকভাবে যেসব মহৎ প্রাণগুলো তাঁর সঙ্গ দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন **নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ (রা.)** ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও সৌভাগ্যশালী একজন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে তার জন্য এই বলে দোয়া করেছেন যে তিনি যেন জান্নাতে তাঁর প্রতিবেশী হন। তিনি একজন বিশিষ্ট আনসারি নারী সাহাবি। মদিনার প্রসিদ্ধ আনসার গোত্র 'বনু নাজ্জারে' তাঁর জন্ম। হিজরত-পূর্ব মদিনায় যেসব নারী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার অদূরে পাহাড়ি উপত্যকায় 'বায়াতে আকাবায়ে সানিয়া' (আকাবার দ্বিতীয় বায়াত) নামে যে ঐতিহাসিক বায়াত সম্পন্ন হয়েছিল, তিনি তার প্রথম সারির সদস্য। ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যে 'বায়াতে রিদওয়ান' সম্পন্ন হয়েছিল সেখানেও তাঁর অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।
তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে কাব এর বোন এবং আব্দুল্লাহ ও হাবিব ইবনে জায়েদ এর মা।   উম্মে উমারাহ নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। যখন তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর তখন তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেন , ওহুদ যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন, ১৩টি স্থানে আঘাত লেগেছিল। আবার ৫২ বছর বয়সে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
সংগ্রামী এই নারী কেবল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবিত থাকা অবস্থায় ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন না, বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফতকালে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিল তাতেও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন, সাহাবিদের জীবনীর ওপর লিখিত কিতাব 'উসদুল গাবাহতে' সে যুদ্ধে তার বীরত্বগাথার কথা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 'মুসাইলামার বিরুদ্ধে যে সৈন্য বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল তার অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ (রা.) । তিনি তাঁর পুত্র হাবিব বিন জায়েদকে নিয়ে এ যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব তাঁর প্রিয় পুত্রকে শহীদ করে। এরপর নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ (রা.) শপথ করেন যে মুসাইলামা জীবিত থাকতে তিনি গোসলের পানি স্পর্শ করবেন না। সে যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে লড়তে লড়তে এক সময় তিনি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সামনে পৌঁছে যান, কিন্তু তিনি আঘাত করার আগেই মুসায়লামাকে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ হত্যা করে ফেলেন। এতে নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ (রা.) দারুন উৎফুল্লচিত্তে তখনই সিজদায় শোকর আদায় করেন।

যুদ্ধ শেষে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর শরীরে তরবারি ও বর্শার ১২টি আঘাত ছিল। এমনকি এ যুদ্ধে তিনি একটি হাতও হারান![উসদুল গাবাহ : ৫/৪৭৬]

তিনিই প্রথম নারী, যিনি ইসলামের জন্য ময়দানে যুদ্ধ করেছেন। প্রথমদিকে যুদ্ধরত সাহাবিদের সেবা-শুশ্রূষা করলেও ওহুদের যুদ্ধে যখন পরিস্থিতি পরাজয়ের দিকে চলে যাচ্ছিল এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চারপাশে কেউ ছিল না, তখন এই নুসাইবা (রা.)-ই রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ঘিরে ধরেন এবং বিপরীত পক্ষের তীরের আঘাত থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে রক্ষা করেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর খেলাফত কালে একবার গনিমতের মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে।

তার মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও দামি। অনেকে বলেন, এটি খলিফার ছেলে আবদুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রীকে দেওয়া হোক। অনেকে খলিফার স্ত্রী কুলসুম বিনতে আলী (রা.)-কে দেওয়ার কথাও বলেন। খলিফা কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি বলেন, এ চাদরের সবচেয়ে বেশি হকদার উম্মে উমারাহ অর্থাৎ নুসাইবা। কারণ আমি ওহুদের দিন তার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

'আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করছিলাম, শুধু উম্মে উমারাহকেই লড়তে দেখছিলাম।' অতঃপর তিনি চাদরটি তার কাছে পাঠিয়ে দেন। [তাবাকাত : ৮/৪১৫; সিয়ারু আলামিন-নুবালা : ২/২৮১]

এই মহীয়সী নারী ১৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ও জান্নাতুল বাকিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন।

★ সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবঃ

চতুর্মুখী মর্যাদা ও গৌরব **সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে** বেষ্টন করে রেখেছিল। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ছিলেন কুরাইশের অবিসংবাদিত নেতা।

তাঁর ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমেনা বিনতে ওহাবের বোন হালা বিনতে ওহাব।

তাঁর প্রথম স্বামী হারেস ইবনে হারব ছিলেন উমাইয়া গোত্রের প্রধান আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-এর সহোদর ভাই।

প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী-আল 'আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলেদ, যিনি ছিলেন (জাহেলী যুগে আরব নারীদের নেত্রী এবং ইসলামী যুগে প্রথম উম্মুল মুমিনীন) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদের ভাই।

তাঁর পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহরক্ষী যুবায়ের ইবনুল 'আউওয়াম। তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বীর সাহাবি যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মা।

সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশ গোত্রে হাশিমী শাখার একজন মহিলা কবি ও সুভাষিণী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তার কয়েকটি শ্লোকঃ

‘হে আমার চক্ষু! অশ্রু বর্ষণ ও রাত্রি জাগরণের
ব্যাপারে বদান্যতা দেখাও। একজন সর্বোত্তম মৃত,
হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্যে বিলাপ কর
প্রচণ্ড দুঃখ- বেদনা সহকারে মুহাম্মাদ আল-মুসতাফার
স্মরণে বিলাপ কর। যে দুঃখ-বেদনা অন্তরে মিলে
মিশে একাকার হয়ে তাকে ঠেস দিয়ে বসানো
রোগগ্রত ব্যক্তির মত করে দিয়েছে।
আমার জীবন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল-
যখন তাঁর সেই নির্ধারিত মৃত্যু এসে যায়,
যা একটি মহা সম্মানিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি কোমল,
দয়ালু ও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক।
জীবন ও মৃত্যু- সর্বাসস্থায় আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় থাকুন
এবং সেই চিরন্তন দিনে আল্লাহ তাঁকে দান করুন জান্নাত।’

[সিয়ারু আ‘লাম আন-নুবালা-২/২৭১, হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৭-৩৪৮]

এত মর্যাদা ও গৌরবের ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা তৈরি হবে নাতো কার জন্য হবে।

তাঁর স্বামী 'আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলেদ যখন মারা গেলেন, তখন যুবায়ের ছিলেন ছোট্টশিশু। সেই শিশু পুত্র 'যুবায়ের'-কে তিনি লালন-পালন করলেন কঠোরতা ও কষ্টের মধ্যে রেখে । তাকে অভ্যস্ত করে তোলেন অশ্বারোহণ আর যোদ্ধার জীবনে । তাঁর খেলা ও খেলনার সামগ্রি ছিলো তির, ধনুক আর বর্শার

যখন মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেকে চিরসত্য আর হিদায়াতের দীন দিয়ে পাঠালেন মানুষের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতারূপে, আর নির্দেশ দিলেন নিজের নিকটাত্মীয়দের মাধ্যমেই দায়িত্বের সূচনা করতে, তখন তিনি আবদুল মুত্তালিবের সকল সন্তানকে, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকে একত্রিত করলেন। বললেন-

'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়্যাহ, ওহে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, যদি তোমাদের ওপর আযাব এসে পড়ে তবে তা ঠেকানোর কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। তোমাদের কোনো উপকারই আমি করতে পারব না।' তাদের আহ্বান করলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের, উৎসাহ দিলেন তাঁর রিসালাতকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে তাদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ এগিয়ে এলেন স্নিগ্ধ আলোর প্রতি, কবুল করে নিলেন সত্যদীন ইসলামকে। কেউ কেউ আবার সেই আলোকে প্রত্যাখ্যান করে রয়ে গেল মিথ্যার অন্ধকারে। সফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন ইসলামগ্রহণকারী, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের প্রথম কাতারে ঠিক তখনই ষোলোকলায় পূর্ণ হলো সাফিয়্যাহকে বেষ্টন করে রাখা গৌরব ও মর্যাদার সকল দিক। বংশের নেতৃত্ব আর ইসলামের অনন্য মর্যাদা।

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু। যাঁর শিরায় শিরায় বয়ে যেত ঈমানি চেতনা। যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন এক নারী নিহতদের দেখার জন্য দৌড়ে আসছিল। নারীরা নিহতদের দেখবে তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অপছন্দ ছিল। তিনি বলেন, এই নারীকে বাধা দাও। কিছুক্ষণ পর দেখি, তিনি আমার মা সাফিয়্যাহ। আমি তাকে বাধা দিলে তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, ছাড়ো আমাকে! দূর হও এখান থেকে। আমি বললাম, রাসুল (সা.) আপনাকে নিহতদের দেখতে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি থেমে গেলেন।

কিন্তু কেন? আমি তো জানি আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা

তাঁর এ কুরবানি আল্লাহর জন্য ...

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইরকে বললেন-

যেতে দাও।

যুবাইর তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন।

যুদ্ধ যখন শেষ হলো, সাফিয়্যাহ তাঁর ভাই হামযার রাঃ এর লাশের কাছে গেলেন, দেখলেন তাঁর পেট ফেড়ে কলিজা বের করা হয়েছে, নাক ও কান কেটে ফেলা হয়েছে, চেহারা বিকৃত করা হয়েছে। তিনি তাঁর জন্য মাগফেরাতের দুআ করলেন। বলতে থাকলেন-
এসবই আল্লাহর দীনের খাতিরে হয়েছে।
আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই। আল্লাহর ফয়সালায় আমি তুষ্ট। সম্পূর্ণ সমর্পিত।
আল্লাহর কসম! আমি সবর করব। আমি মনে করব আমার এ বিপদ আল্লাহর দীনের জন্য এবং সে কারণে এর পূর্ণ প্রতিদান অবশ্যই পাব ইনশাআল্লাহ।
তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের আবেগ ও অনুভূতির ওপর রাসুল (সা.) এর আদেশ মান্য করাকে প্রধান্য দিয়েছেন। যা এই সঙ্গীন মুহূর্তে খুবই কষ্টকর। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]
খন্দক যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদেরকে একটি দূর্গে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। সেই দূর্গে মুসলিম মহিলাদের সাথে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবি হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যুদ্ধে যেতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা জানতেন। ফলে তাঁকে রাখা হয় নারীদের দূর্গে। সেই দূর্গে ছিলেন সাহসী সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা।
একদিন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন যে, এক গুপ্তচর দূর্গের আশেপাশে ঘুরছে। এটা নিরাপত্তার প্রশ্ন। যদি সে জানতে পারে যে, এখানে সবাই মহিলা, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কোনো যোদ্ধা নেই, তাহলে তো বিপদ।
সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, “তাকে হত্যা করো। নতুবা আমাদের তো বিপদ হবে।”
হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরাপত্তার প্রশ্নেও ছিলেন অনেকটা নির্বিকার। তিনি বললেন, “আপনি জানেন যে, আমার কাছে এর কোনো প্রতিকার নেই। যদি থাকতো, তাহলে তো আমি রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধে থাকতাম!”
সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন হাসসানকে বলে কোনো লাভ হবে না। তিনি নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে গুপ্তচরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং গুপ্তচরকে হত্যা করতে সক্ষম হোন। গুপ্তচরেরর কাটা মাথা তিনি দূর্গের ওপারে ছুঁড়ে মারেন। ফলে দূর্গের বাইরে থাকা ইহুদিরা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারা ধারণা করে যে, ভেতরে মনে হয় মুসলিম যোদ্ধারা আছে!
সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন যে, “আমিই প্রথম মহিলা, যে একজন পুরুষকে হত্যা করেছি।”
[সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা : ২/২৭০]

সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব শাসনামলে ২০ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে মুগীরা ইবন শুবার আঙ্গিনায় অজুখানার পাশে তাকে দাফন করা হয় [তাহজীবুল আসমা' ওয়াললুগাত-১/৩৪৯]

★ **কাবশা বিনতে রাফেঃ**

কাবশা বিনতে রাফের নবীপ্রেম ছিলো অন্যরকম। প্রসিদ্ধ সিরাত বিশেষজ্ঞ ওয়াকেদি বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দৌড়ে আসেন। তখন সাদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ইনি তো আমার মা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মারহাবা বলেন। মুয়াজের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকে নিরাপদে দেখে আমার সব বিপদ হালকা হয়ে গেল। নবীজি তাঁর ছেলে আমর ইবনে মুয়াজ ব্যাপারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'হে উম্মে সাদ, তুমি খুশি হও এবং শহীদদের পরিবারের লোকজনকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে শহীদরা জান্নাতে সবাই এক সঙ্গে রয়েছে। আর তাদের পরিবারের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল হবে।' তারা বলল, আমরা সন্তুষ্ট। এমন সুসংবাদ শুনে কান্না করবে। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ , তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যও দোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাদের অন্তরের দুঃখসমূহ দূর করে দিন, তাদের বিপদের বিনিময় প্রদান করুন এবং জীবিত ওয়ারিশদের উত্তম প্রতিদান দিন।' [আস সিরাহ আল হালবিয়্যাহ : ২/৪৭]

★ **রুফাইদা আল-আসলামিয়া (রা.)**

রুফাইদা আল-আসলামিয়া (রাঃ) ছিলেন প্রথম মহিলা মুসলিম সেবিকা হিসাবে স্বীকৃত একজন মুসলিম নার্স, শল্যচিকিৎসক এবং সমাজ কর্মী। মদিনায় ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম লোকদের মধ্যে রুফাইদা আল-আসলামিয়া মদিনায় খাজরাজ গোত্রীয় বনি আসলেম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামের নবী মুহাম্মদকে মদিনায় আগমনের পরে অন্যান্য আনসার মহিলাদের সাথে স্বাগত জানানোর কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাই তাঁকে রুফাইদা আল আসলামিয়া (রা.) নামেই সবাই চিনতেন। মদিনায় রাসুল (সা.) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলে সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা মুসলিম সেবিকা হিসেবে স্বীকৃত একজন ইসলামী চিকিৎসক। তিনি ছিলেন চিকিৎসায় পারদর্শী। আহতদের চিকিৎসা, বিনামূল্যে অসুস্থদের সেবা- এই ছিল তার জীবনের ব্যস্ততা। দুর্বল ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতেন। যুদ্ধের ময়দানে

আহতদের সেবা, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো তার বিশেষ কাজের অন্যতম। তরবারির ঝনঝন শব্দ আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি মূলত তাঁর চিকিৎসক বাবা সাদ আল-আসলামীর কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে রাসুল (সা.) যুদ্ধে আহত সব সৈনিককে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য পাঠাতেন। তিনি আহতদের সেবায় মসজিদে একটি তাঁবু করেছিলেন। তাঁর দায়িত্বাধীন সেই অস্থায়ী হাসপাতালকে বলা হতো খিমাতু রুফাইদা। মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধের দিন সাআদ (রা.)-এর চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে রুফাইদা নামক এক মহিলার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী (সা.) সকাল-সন্ধ্যায় সাআদ (রা.)-এর কাছ দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার দিন কেমন কাটল, তোমার রাত কেমন কাটল? তিনি তাঁকে (নিজ অবস্থা) অবহিত করতেন। (আদবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১৩৯)

তার জীবনের বিশদ বিবরণ তো ইতিহাসে আসেনি, কিন্তু যতটুকু এসেছে তা দ্বারাই আমরা এই মহীয়সী নারীর উজ্জ্বল কীর্তিগাঁথা সম্পর্কে জানতে পারি।

তার সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি :

ইবনে সা‘দ রাহ. বলেন, তিনি হিজরতের পরে বাইআত হয়েছেন। মসজিদে নববীর পাশেই তার তাঁবু ছিল। সেখানে তিনি অসুস্থ এবং আহতদের সেবা করতেন। সা‘দ বিন মুআয রা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার সেবা করেছেন। তিনি খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। [তাহযীবুত তাহযীব ২৭৯১; তবাকাতে ইবনে সা‘দ]

ওয়াকিদী রাহ. বলেন, তিনি আহতদের সেবা করতেন। অসুস্থদের চিকিৎসা করতেন। অসহায় এবং অনাথের পাশে দাঁড়াতেন। মসজিদের পাশেই তার খীমা ছিল। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘দ বিন মুয়াযকে তার খীমাতেই রেখেছিলেন। [কিতাবুল মাগাযী ২/৫১০]

হাদীসে রাসূলে তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

মাহমুদ বিন লাবীদ রা. বলেন, খন্দকের যুদ্ধে যখন সা‘দ বিন মুয়ায রা. আহত হলেন তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে রুফাইদার খীমাতে নিয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, রুফাইদা রা. হলেন এমন এক নারী, যিনি আহতদের সেবা করতেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা তার খবর নিতেন। [আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ১১২৯]

অর্থাৎ খাইমাতু রুফাইদা (রুফাইদার তাঁবু) যেন মানুষের কাছে এক প্রসিদ্ধ নাম ছিল, আহতদের সেবার এক আস্থাভাজন কেন্দ্র ছিল। তাই তো মসজিদের নিকটেই ছিল তার

তাঁবু। নবীজীর খুব কাছাকাছি। মুআয রা. আহত হলেই নবীজী তাকে রুফাইদার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন। কত আস্থার সাথে। কত নির্ভরতার সাথে। বললেন, তাকে (সা'দ বিন মুআয রা.) রুফাইদার তাঁবুতে নিয়ে যাও, যেন আমি তাকে সকাল-সন্ধ্যা দেখতে পারি।

রুফাইদা রা.-এর মত আরো অনেক নারী সাহাবী জিহাদের কঠিন মুহূর্তেও আহতদের সেবায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতেন। বিশেষত আসলাম গোত্রের নারীরা। এই গোত্রেরই আরেক নারী হলেন উম্মে সিনান আসলামী। নবীজীর কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন; আহতদের ঘায়ে মলম, পিপাসার্তের মুখে পানি- এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জামের জন্য। নবীজী অনুমতি দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর বরকত নিয়ে বের হও। তোমার কওমের আরো অনেক নারী আছে, আমি যাদেরকে অনুমতি দিয়েছি, তুমি চাইলে তাদের সাথে থাকতে পার।[(আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ৪২৪৪]

রুফাইদা রা.-ও তিনি আসলাম গোত্রের একজন ছিলেন। দিন-রাত এক করে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন মানবসেবায়। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও সেবা বন্ধ থাকেনি। অস্ত্রের ঝনঝনানির মাঝেও তার কাজ থেমে থাকেনি। মানুষও ছুটে আসত তার তাবুতে। তাইতো অনেক ঐতিহাসিক 'খাইমাতু রুফাইদা'কে মুসলিম ইতিহাসের প্রথম মুসতাশফা বা চিকিৎসালয় আখ্যা দিয়েছেন।

যুদ্ধ ছাড়াও সাধারণ সময়েও মানুষের কাছে তার তাঁবু ছিল বাতিঘরের মত। তা ছিল অসুস্থ মানুষের আস্থার ঠিকানা। মুখে মুখে তাই ছড়িয়ে গিয়েছিল 'খাইমাতু রুফাইদা'র নাম।

খাইবার যুদ্ধে আহত মুসলিম মুজাহিদদের সুস্থ করতে তিনি মাতৃত্বের মমতাময়ী হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগ এবং সেবা-শুশ্রূষার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসুল (সা.) পুরুষ মুজাহিদদের সঙ্গে তাঁকেও গণিমতের মালের হিস্যা দিয়েছিলেন। আজকের বিশ্বেও তিনি নারী চিকিৎসক ও নার্সদের আইডল হয়ে আছেন। তাঁর সম্মানে বাহরাইনের Royal College of Surgeons in Ireland প্রতিবছর `Rufaida Al-Aslamia Prize in Nursing প্রদান করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক রোগীদের সেবা দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। [সৌদি গ্যাজেট]

★ আসমা বিনতে আবু বকরঃ

আসমা বিনতে আবু বকর হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হিজরতকারী ও ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার মাতা ছিলেন কুতাইলা বিনতে আবদুল উযযা, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তার ছোট বোন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয়ারির বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন তাঁর স্বামী যুবাইর

ইবনুল আওয়াম। সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবনদানকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা তিনি। আসমা বিনতে আবু বকর হিজরতের ২৭ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) , ইসলামের শুরু দিকেই ঈমান আনেন। ইবন ইসহাক রহ.-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ১৭ জনের পর। প্রসিদ্ধ সাহাবী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই হযরত যুবায়র ইবনুল আউওয়াম রাঃ , -এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা).-এর উপাধি ছিল 'যাতুন নিতাকায়ন' অর্থাৎ দুই কোমরবন্দওয়ালী, অথবা দুই ফিতাওয়ালী। কোনও কোনও বর্ণনানুযায়ী তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ উপাধির কারণ এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. যখন হিজরত করেন, তখন আসমা রাযি. রাস্তায় তাঁদের খাবার-দাবারের যে বন্দোবস্ত করেছিলেন তা বাঁধার জন্য কোনও কাপড় পাচ্ছিলেন না। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছে এ সমস্যার কথা ব্যক্ত করলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. তাঁকে তাঁর নিতাক (কোমরবন্দ) ছিড়ে ফেলতে বলেন। এক বর্ণনানুযায়ী সেটি ছিল তাঁর দোপাট্টা। সুতরাং তিনি সেটি ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলেন। এক টুকরো দিয়ে সে খাবার বাঁধেন, আরেক টুকরো দিয়ে কোমরবন্দ বানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার এ নিতাক (কোমরবন্দ) -এর বিনিময়ে জান্নাতে দু'টি কোমরবন্দ দান করবেন। এরই থেকে তাঁর ওই উপাধি।

হযরত আসমা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এক নারী। তাঁর বুদ্ধিও ছিল প্রখর। অশীতিপর বার্ধক্য অবস্থায়ও তাঁর বুদ্ধিতে কোনও ছেদ পড়েনি। দৈহিকভাবেও খুব বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর নাতি হিশাম ইবন উরওয়া রহ. বলেন যে, একবার মদীনায় চোর-ডাকাতের উৎপাত বেড়ে গেল। সেটা ছিল সাঈদ ইবনুল আসের শাসনকাল। এ সময় আসমা রাযি. তাঁর শিয়রে একটি খঞ্জর রেখে ঘুমাতেন।

পুত্র উরওয়াহ রহ. বলেন, আমার ভাই আব্দুল্লাহ শহীদ হওয়ার দশদিন আগে আমি তাকে নিয়ে মায়ের কাছে যাই। তখন মা খুব অসুস্থ। ভাই আব্দুল্লাহ বললেন, মা, কেমন বোধ করছেন? বললেন, কষ্ট পাচ্ছি। ভাই বললেন, মৃত্যুতে কষ্টের অবসান হয়। মা বললেন, তুমি বোধহয় আমার মৃত্যু কামনা করছ? এটা ঠিক নয়। এই বলে তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করি না, যতক্ষণ না তোমার দুই অবস্থার একটি ঘটে- হয় আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাবে আর আমি সেজন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার আশা করব, অথবা তুমি জয়লাভ করবে আর তা দেখে আমার চোখ জুড়াবে।

উরওয়াহ রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ যে বলেছিলেন মৃত্যুতে কষ্টের অবসান, এর দ্বারা আসলে তিনি বুঝাচ্ছিলেন তিনি যদি শত্রুর হাতে নিহত হন তবে তো মা অনেক কষ্ট পাবেন। আগে মারা গেলে তাকে সেই কষ্ট পেতে হবে না ।

শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মুখের সবগুলো দাঁত অটুট ছিল। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাযি. শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হাজ্জাজ ইবন ইয়ুসুফ তাঁর লাশ দীর্ঘদিন শূলে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর মা আসমা বিনতু আবূবকর (রাঃ)-কে ডেকে আনার জন্য দূত পাঠালেন। কিন্তু তিনি তার নিকট আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দূত প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যে. অবশ্যই আপনাকে আমার নিকটে আসতে হবে।

অন্যথা আপনার নিকটে এমন লোক পাঠাব যে আপনাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, এরপরও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট আসব না, যতক্ষণ না তুমি আমার নিকট এমন লোক পাঠাবে, যে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন, তারপর হাজ্জাজ জুতা চাইলেন এবং তা পরে সদর্পে আসমা (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছালেন এবং বললেন, আপনি কি দেখেননি আল্লাহর শত্রুর সাথে আমি কী ব্যবহার করেছি? আসমা বললেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। তবে আমি যা দেখেছি তা হ'ল, তুমি তার দুনিয়া বরবাদ করে দিয়েছ। আর সে তোমার আখেরাত নষ্ট করে দিয়েছে'। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকে (তিরস্কার স্বরূপ) 'দু'টি কোমরবন্ধনী ব্যবহারকারীণীর ছেলে' বলে সম্বোধন করে থাকো। আল্লাহর শপথ! আমিই দু'কোমরবন্ধ ব্যবহারকারিণী। এর একটির মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূবকর (রাঃ)-এর খাদ্যদ্রব্য বেঁধে তুলে রাখতাম, যাতে বাহনের পশু খেয়ে ফেলতে না পারে। অপরটি হ'ল যা স্ত্রীলোকের জন্য প্রয়োজন। জেনে রাখো, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ছাকীফ সম্প্রদায়ে একজন মিথ্যুক এবং রক্ত প্রবাহকারীর আগমন ঘটবে। মিথ্যুককে তো আমরা সকলে দেখেছি। আর রক্ত প্রবাহকারী হিসাবে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মনে করি না। এ কথা শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং আসমা (রাঃ)-এর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল' (মুসলিম হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৯৯৪)

এর পর এ অবস্থায় হযরত আসমা রাযি. মক্কায় গমন করেন এবং পুত্রের লাশ স্পর্শ করেন। তারপর হাজ্জাজের সঙ্গে দেখা করে বলেন, এখনও কি এই বীর আরোহীর নামার সময় আসেনি?

হাজ্জাজ বলেছিল, ওই মুনাফিকের কথা বলছ?
তিনি উত্তরে বলেন, না, আল্লাহর কসম! সে কখনওই মুনাফিক ছিল না। সে খুব রোযা রাখত, অনেক বেশি নামায পড়ত।
হাজ্জাজ বলল, যাও বুড়ি, তোমার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে।
তিনি বললেন, কখনও নয়। আল্লাহর কসম! আমার বুদ্ধি নাশ হয়নি। তবে শোন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ছাকীফ গোত্রে এক ঘোরমিথ্যুক ও এক নিষ্ঠুর নরঘাতকের জন্ম হবে। ঘোরমিথ্যুককে তো দেখেছি (অর্থাৎ মুখতার ছাকাফী), আর যে নরঘাতকের কথা বলা হয়েছে সে তুমিই।
হযরত আসমা রাযি.-এর আল্লাহভীতি ছিল অতি গভীর। জীবনভর ইবাদত-বন্দেগী ও দীনের খেদমতেই লেগে থেকেছেন। কখনও মাথাব্যথায় কষ্ট পেলে তিনি মাথায় হাত রেখে বলতেন, এটা আমার গুনাহের কারণে, তবে আল্লাহ তাআলা যা ক্ষমা করেন তা অনেক অনেক বেশি। তিনি ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. দু' বোনই অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। তবে দু'জনের দানের ধরন ছিল ভিন্ন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. অল্প অল্প করে জমা করতেন। যখন উল্লেখযোগ্য একটা পরিমাণ জমে যেত, তখন তা যেখানে যেখানে প্রয়োজন দান করে দিতেন। কিন্তু আসমা রাযি. আগামী দিনের জন্য কিছুই রাখতেন না। যখন যা হাতে আসত তাই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলতেন।
তাঁর মালিকানায় কখনও কোনও গোলাম আসলে সে গোলামকেও সঙ্গে সঙ্গেই আযাদ করে দিতেন। রোগীর সেবাযত্ন করাও তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। যখনই যে রোগী সম্পর্কে খবর পেতেন, তার কাছে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় সেবা করতেন।
স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তাঁর খুব দক্ষতা ছিল। পিতা আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছ থেকে তিনি এর শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাবি'ঈদের মধ্যে এ বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশি পারদর্শী ছিলেন হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.। তিনি এটা হযরত আসমা রাযি. -এর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তিনি অনেক দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। এ মহিয়সী মহিলা সাহাবি হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা দীর্ঘ একশত বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। মহিলা সাহাবিদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ হিজরি ৭৩ সনের ২৬ জমাদিউস সানি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের সপ্তাখানেক আগেই তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ রাযি. শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর নাতি হিশাম ইবন উরওয়াহ'র মতে তাঁর বয়স হয়েছিল একশ' বছর। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

অনন্য মর্যাদায় সমাসীন সাত কৃষ্ণাঙ্গ সাহাবি

ইসলাম মানুষের অভিন্ন মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতা কখনো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

‘আমি আদম-সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।’ (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭০)

বর্ণবৈচিত্র্যের রহস্য : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ মানবজাতির বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণে বিভক্ত হওয়ার রহস্য উন্মোচন করে বলেন, ‘হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানী যে বেশি আল্লাহভীরু।’ (সুরা হুজরাত, আয়াত : ১৩)

ইসলামে বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ : ইসলাম বর্ণবৈষম্যসহ যেকোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে মানুষ তার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির দ্বারা অন্যের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে। বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেন, ‘হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহভীরু। কোনো আরব কোনো অনারবের ওপর আল্লাহভীতি ছাড়া বেশি মর্যাদাবান ও সম্মানী হতে পারে না।’ (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ১০০)

অনন্য মর্যাদায় সমাসীন সাত কৃষ্ণাঙ্গ সাহাবি : ইসলাম যে বৈষম্যহীন সমাজের দীক্ষা দিয়েছে তার প্রতিফলন রাসুলের যুগেই সমাজে সমাজে খুঁজে পাওয়া যায়। যে সমাজে কৃষ্ণাঙ্গ ও দাস বহু নারী ও পুরুষ অনন্য মর্যাদায় সমাসীন হন।

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের এমন সাতজন সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করব, যাদের গায়ের রং কালো ছিল। এই কালো সাহাবী-রা ছিলেন চূড়ান্ত সম্মানিত। কিন্তু গায়ের কালো বর্ণ তাদেরকে সম্মানিত হওয়ার মাঝে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কালো সাহাবী-দের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন-

১. উম্মে আইমান (রা.) : নবীজির উম্মে আইমান নামে একজন মা ছিল; যিনি তাঁর যৌবনকাল বিসর্জন দিয়েছেন নবীজির লালন-পালনের জন্য। তিনি ছিলেন নবীজি (সা.)-এর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া দাসী। নবীজি সাল্লাল্লাহ আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদও প্রদান করেছিলেন।

নবীজি বয়স্কা অবস্থাতেই তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। যায়েদ ইবনে হারিসা(রাযিঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। নবীজি মৃত্যুর আগে সাহাবীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গিয়েছিলেন। সেই সব কথার মধ্যে একটা ছিল, “তোমরা উম্মে আইমানের যত্ন নিবে, তিনি আমার মায়ের মত। তিনিই একমাত্র নারী, যিনি আমাকে জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাশোনা করেছেন।

আমার পরিবারের সাহাবীরা সেই কথা রেখেছিলেন। গায়ের রং-এ তাঁর পরিচয় হয়নি। এক সময়ের ক্রিতদাসী হিসেবে তিনি পরিচিত হননি। তাঁর পরিচয় হল, তিনি আমাদের প্রিয় নবীর আরেক মা। মায়ের মত করে সাহাবীরাও এই বৃদ্ধা নারীকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলেন। একমাত্র সদস্য, যিনি সারাজীবন আমার পাশে ছিলেন।”

২. সাদ আল-আসওয়াদ (রা.) : তিনি ছিলেন গরীব, গায়ের রঙ ছিল কালোবর্ণের। কেউ তাঁর কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দিতে চাইত না। সা'দ(রাযিঃ) একদিন নবীজীর কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও কি জান্নাতে যাবো? আমি তো নীচু মাপের ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হই, কোনো মেয়ে আমার সাথে বিবাহ বসতে রাজি হয় না।”

নবীজি (সা.) তাঁর দুঃখ বুঝতে পেরে তাঁকে ধনাঢ্য এক ব্যক্তির রূপসী মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাঁকে মানা করে দেন। নবীজি পাঠিয়েছেন শুনে ঐ ব্যক্তির মেয়ে জোরজবরদস্তী করে বিয়েতে রাজি হন। কিন্তু তাদের বিয়ের আগেই এক জিহাদে শহীদ হয়ে যান সাদ (রা.) । নবীজি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং তাঁর সম্মানে জান্নাতের হুররা যে দুনিয়াতে অবতরণ করে তাঁর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তা অন্য সাহাবিদের অবগত করেন। এভাবেই কালো এই সাহাবী সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

৩. উসামা বিন জায়েদ (রা.) : উসামা বিন জায়েদ (রা.) ছিলেন রাসুল (সা.)-এর পালকপুত্র জায়েদ (রা.)-এর ছেলে। পিতা-পুত্র উভয়কেই নবীজি খুব ভালবাসতেন এবং তাদেরকে অনেক বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নবীজি (সা.) তাঁদের ওপর অর্পণ উসামা(রাযিঃ) নবীজীর নিকট এতটা বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় শেষ যেই বাহিনী তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর আমির(জিম্মাদার) হিসেবে তিনি উসামা(রাযিঃ)-কে নিয়োগ দেন। যদিও সেই বাহিনীতে ওমর ও আবু বকর (রা.)-এর মতো আরো বহু মর্যাদাবান সাহাবি উপস্থিত ছিল। এভাবেই ক্রীতদাসের পুত্র হওয়া বা কৃষ্ণবর্ণের হওয়া তাঁর যোগ্যতার মাঝে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

৪. আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) : আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন ক্রীতদাস। আবার তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। কিন্তু নবীজী তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে জীবদ্দশায় শাহাদাত ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। দিয়েছেন। মক্কী যুগে কঠোর নির্যাতন ভোগ করেও তাঁর পরিবারের কেউ ইসলাম থেকে দূরে সরেননি। এমনকি তাঁর মা সুমাইয়া(রাযিঃ) ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছিলেন। এভাবেই, কালোবর্ণের হওয়ার পরেও আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

৫. জুলাইবিব (রা.) : তিনি নবীজি (সা.)-এর একজন কম পরিচিত সাহাবি। মুসলিমদের মাঝে অনেকেই তাঁর কথা হয়তো কখনই শোনেননি। তাঁকে ডাকা হতো ‘জুলাইবিব’ নামে। জুলাইবিব আসলে কোনো নাম নয়, এটি একটি উপনাম। আরবিতে এই শব্দের অর্থ ‘ক্ষুদ্র

পূর্ণতাপ্রাপ্ত'। তাঁকে এই নামে ডাকা হত কারণ তিনি ছিলেন উচ্চতায় অনেক খাটো। এছাড়া তাকে অনেকে 'দামিম' নামেও ডাকত, যার অর্থ কুশ্রী, বিকৃত অথবা দেখতে বিরক্তিকর। যে সমাজে তিনি বাস করতেন, সেখানে তার প্রকৃত নাম-বংশ পরিচয় কেউ জানত না। তিনি যে কোন গোত্রের ছিলেন, তাও ছিল সকলের নিকট অজানা। তৎকালীন সমাজে এটা ছিল এক চরম অসম্মানের বিষয়। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে জুলাইবিব নামে ডাকা হতো। কিন্তু এই সাহাবীই আখিরাতে হয়েছেন চরম সৌভাগ্যবানদের অতর্ভুক্ত। এক জিহাদে শদীদ হওয়ার পর নবীজী তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁকে নিজ হাতে করে কবরে নামিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেছেন।এভাবেই, সমাজচ্যুত-ভাগ্যাহত কালো এক বামন সাহাবী শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার কারণে চূড়ান্ত স্তরের সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

৬. বেলাল হাবশি (রা.) : ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বেলাল (রা.)। বেলাল(রাযিঃ)-কে চেনে না এমন মুসলিম হয়ত পাওয়া মুশকিল। কঠিন নির্যাতনের মধ্যেও যিনি ইসলামের ওপর ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। কালোবর্ণের ক্রীতদাস হয়েও তিনি অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁকে বলা হয়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুয়াজ্জিন। মহানবী (সা.) তাঁকে মসজিদে নববী ও সফরে মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন। জান্নাতে তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে এসে নবীজি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। এমনকি তাঁকে এ কথাও বলেন যে হাশরের ময়দানে কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি নবীজি (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে আগে আগে হাঁটবেন এবং তাঁর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৭. আবু জর গিফারি (রা.) : দুনিয়াবিরাগী সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ইসলামের জন্য তিনি কঠোর সাধনা করতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হলেও, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সবকিছু ত্যাগ করে গরিবি জীবন বেছে নেন। তিনি সার্বক্ষিণক নবীজীর সহচার্য্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সার্বক্ষণিক নবীজির সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহকে খুব ভয় করতেন ও নবীজীকে খুব বেশি ভালোবাসতেন এবং নবীজীও তাঁকে ভালোবাসতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর শাসকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করায় তিনি নির্বাসিত হয়ে মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় সোনায় মোড়া কিশোর সাহাবি

সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা-

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।' (সুরা বাইয়িনা: ৮)

ইসলামের পথে মহানবীর (স.) আহবানে সর্বশ্রেণির মানুষ সাড়া দেয়। তাঁদের মধ্যে নারী, শিশু, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমন সোনার কিশোরও ছিলেন, যাঁরা ইতিহাসে অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)

আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.) ছিলেন ইসলামগ্রহণে অগ্রগামী সাহাবিদের একজন। কারো কারো মতে, তিনি ১২তম পুরুষ হিসেবে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ১৬ বছর বয়সে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের আগে মহানবী রাসুল (সা.)-তাঁর বাড়িতে সাহাবিদের দ্বীন শেখাতেন। হিজরতের পর তিনি রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৫৫ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাঁর জানাজা নামাজের ইমামতি করেন।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)

ইসলামের বীর সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে নবীজি (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক কাদেসিয়ার যুদ্ধ, জালুয়ার যুদ্ধ ও মাদায়েন যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন কুফায় নিযুক্ত প্রথম মুসলিম প্রশাসক। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইসলামের পক্ষে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। তিনিও ওমর (রা.) কর্তৃক গঠিত শুরার সদস্য ছিলেন। সাদ (রা.) ৫৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

জায়েদ বিন সাবিত (রা.)

মাত্র ১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন জায়েদ বিন সাবিত (রা.)। তিনি একাধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মহানবী (স.) তাঁকে ওহি লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও নবীজি (স.) বয়স অল্প হওয়ার কারণে তাঁর আবেদন গ্রহণ করেননি। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। কোরআন ও কোরআনের পাঠসংক্রান্ত জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে কোরআন সংকলন কমিটির প্রধান নিযুক্ত করা হয়। জায়েদ বিন সাবিত (রা.) ছিলেন মদিনার প্রধান কারি ও মুফতি। ৪৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) : উহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মর্মন্তুদ একটি ঘটনা। এই যুদ্ধে বহু সাহাবি শহীদ হন এবং স্বয়ং রাসুলে আকরাম (সা.) রক্তাক্ত হন। এই মহান বীর সাহাবি মাত্র ১৬ বছর বয়সে উহুদ যুদ্ধে অংশ নেন।

শুধু তা-ই নয়, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে মৃত্যুর শপথ নেন। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে নবীজি (সা.)-কে যখন হামলা করছিল তিনি নিজের শরীর দিয়ে তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ওমর (রা.) তাঁকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য গঠিত শুরার সদস্য করেন। তিনি ইসলামের পক্ষে বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং জনকল্যাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ৩৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের একজন।

জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)

জুবায়ের ইবনুল আউয়াম (রা.) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের একজন। সম্পর্কে তিনি নবীজি (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। অন্যদিকে তিনি আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর স্বামী হিসেবেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয় ছিলেন। নবী (সা.) তাঁকে নিজের ‘হাওয়ারি’ তথা সাহায্যকারী আখ্যা দেন। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইসলামের পক্ষে সর্বপ্রথম তরবারি কোষমুক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধ ও মিসর বিজয়ের সাক্ষী ছিলেন। ওমর (রা.) কর্তৃক গঠিত শুরার সদস্য ছিলেন। তিনি ৩৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

মুয়াজ ইবনে আমর (রা.)এবং মুয়াওবিজ বিন আফরা (রা.)

মুয়াজ ও মুয়াওবিজ (রা.) : মুয়াজ বিন আমর (রা.) ১৩ বছর বয়সে এবং মুয়াওবিজ বিন আফরা (রা.) ১৪ বছর বয়সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে কিশোর সাহাবি মুয়াজ ইবনে আমর (রা.) এবং মুয়াজ ইবনে আফরা (রা.)-এর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয়। ইসলামের চরম শত্রু আবু জাহেলকে হত্যার মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বয়স নয়, বরং ঈমানের গভীরতা ও দৃঢ় মনোবলই মূল শক্তি।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন, আমি বদরের দিন যুদ্ধ সারিতে অবস্থান করছিলাম।

এমন সময় আমি আমার ডান ও বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি যে আমি দুজন আনসারী তরুণের মাঝে আছি। আমি তখন আশা করেছিলাম, যদি আমি দুজন শক্তিশালী যুবকের মাঝে থাকতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে ইঙ্গিতে বলল, হে চাচা! আপনি কি আবু

জাহেলকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন হে ভ্রাতুষ্পুত্র? সে বলল, আমি সংবাদ জেনেছি যে সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে গালাগাল করে।
সেই আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তবে অবশ্যই আমার দেহ তার তীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না—যতক্ষণ না আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু আগে হওয়া অবধারিত তার মৃত্যু হয়। বর্ণনাকারী বলেন, কিশোরের এই কথা শুনে আমি আচর্যান্বিত হলাম। তারপর অন্য কিশোর আমার দিকে ইঙ্গিত করে অনুরূপ কথা বলল। পরে বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি, হঠাৎ আমি দেখলাম আবু জাহেল লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, আমি তখন কিশোর দুজনকে বললাম, এই সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ।
তারা উভয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করল এবং হত্যা করে ফেলল। অতঃপর উভয়েই ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কে হত্যা করেছে? তাদের প্রত্যেকেই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের তলোয়ার কি মুছে ফেলেছ? তারা তখন বলল, না। তখন তিনি (উভয়ের তলোয়ার (পরীক্ষা করে) দেখলেন।
তারপর বলেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। অতএব, তিনি মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহকে সালাব প্রদানের নির্দেশ দেন। (আর সেই দুই ব্যক্তি হলেন মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহ এবং মুয়াজ ইবনে আফরা (রা.) (মুসলিম, হাদিস : ৪৪১৭)। মুয়াজ (রা.) উসমান (রা.)-এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। মুয়াওবিজ (রা.) ৩৭ হিজরি মতান্তরে ৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

উসামা বিন জায়েদ (রা.)

উসামা বিন জায়েদ (রা.) নবীজী (সা.)-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন উসামা বিন জায়েদ (রা.)। নবীজি (সা.) অধিক ভালোবাসতেন বলে তাঁকে ‘হুব্বুর রাসুল’ (রাসুলের ভালোবাসা) বলা হতো। উসামা (রা.)-এর পিতা জায়েদ ছিলেন নবীজি (সা.)-এর সেবক ও পালকপুত্র। মৃত্যুর পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.) রোমান বিরুদ্ধে প্রেরিত এক বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর মতান্তরে ১৮ বছর। এই অভিযানে বহু মর্যাদাবান সাহাবি অংশগ্রহণ করেন। ৫৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।
(কিশোর সাহাবী সিরিজ)

পবিত্র কুরআন থেকে সাহাবা কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা

সাহাবীগণের সংখ্যা লক্ষাধিক। নবী-রাসূরগণের পরই তাদের মর্যাদা। সাহাবিরা যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাঁদের একনিষ্ঠ ভালোবাসা, ইসলামের জন্য ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ তাঁদের চির স্মরণীয় করেছে ইতিহাসের পাতায়। তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য তারকাতুল্য ও অনুসরণীয়। কুরআন ও হাদিসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কুরআনের বিশেষ কিছু আয়াতে দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত ও নির্বাচিত একটি বিশেষ জামাত, যারা নিজেদের জীবনের মায়া উপেক্ষা করে সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দিয়েছেন এবং নিজেদের জান মাল ব্যয় করে ইসলামের যে পরিমাণ খেদমত করেছেন। যা অন্য কারোর পক্ষে কোনো সময়ই সম্ভব নয়। তারা আগ্রহ ও নিঃসঙ্কোচতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করতেন । তাদের উঠাবসা চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দৃষ্টান্ত হীন আত্মদানের মাধ্যমেই দুনিয়াতে ইসলাম টিকে আছে। যাদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক পছন্দনীয় ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি : মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরাজি (রহ.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, রাসুল (সা.)-এর সাহাবি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতবাসী হবেন—যদিও দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এ কথা আপনি কোথা থেকে বলছেন? তখন এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০০; মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা ৫৯১)

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। এর প্রমাণ হলো কুরআন করীমের এ আয়াত। এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত

সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه) এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য। এ ব্যাপারে আরও প্রমাণ হলো,

আল্লাহ্ তা'আলার বলেছেন,

৪. অপর জায়গায় –

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লহ তায়া'লা ঐ সকল মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (যাহারা আপনার সফর সঙ্গী), যখন তাঁহারা আপনার সাথে গাছের নিচে অঙ্গীকার করছিলো এবং তাঁদের অন্তরে যা কিছু (ইখলাস ও মজবুতি) ছিল তাও আল্লহ তায়া'লার জানা ছিল, আর আল্লহ তায়া'লা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (এর দ্বারা খায়বরের বিজয় কে বুঝানো হয়েছে, যা একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করলেন। (সূরা ফাতহঃ ১৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল। আর যে সব লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। তাদেরকে তুমি দেখবে রুকূ' ও সাজদায় অবনত অবস্থায়, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে নিয়োজিত। তাদের চিহ্ন হল, তাদের মুখমণ্ডলে সেজদা্র প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতে আছে, তাদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলেও আছে। (তারা) যেন একটা চারাগাছ তার কচিপাতা বের করে, তারপর তা শক্ত হয়, অতঃপর তা কান্ডের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়- যা চাষীকে আনন্দ দেয়। (এভাবে আল্লাহ মু'মিনদেরকে দুর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় ক'রে দেন) যাতে কাফিরদের অন্তর গোস্বায় জ্বলে যায়। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম

করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সূরা আল ফাত্হ, আয়াত ২৯]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সুরা হাশরের ৮, ৯ এই দুই আয়াতে বলেছেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন , এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী।

এ আয়াতে মুহাজিরদের আল্লাহ রব্বুল আরশীল আযীম মুহাজিরদের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন,

তাদের প্রথম গুণ এই যে, তারা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। তারা মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা মাতৃভূমি ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতে বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন।

তাদের দ্বিতীয় গুণ হল, তারা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিই তাদের কাম্য ছিল।

মুহাজিরদের তৃতীয় বৈশিষ্ট বা গুণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল উপরোক্ত সব কিছু করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা।
চতুর্থ গুণ হল, তারা কথা ও কাজে সত্যবাদী। [তাবারী, ইবন কাসীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]
৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন , (আর এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকেই (মাদীনাহ) নগরীর বাসিন্দা ছিল আর ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোন কামনা রাখে না, আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়- নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত: যাদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।

এখানে আনসারগণের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন।

সুতরাং আনসারদের একটি গুণ এই যে, যে শহর আল্লাহ তা'আলার কাছে 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ঈমান হওয়ার ছিল, তাতে তাদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

আনসারদের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে,
"তারা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন।" এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত: লোকেরা এহেন ভিটে-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্য কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিস্পত্তি করতে হয়েছে। [দেখুন-ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর,বাগাভী] হাদীসে এসেছে, আনসারগণ এসে বললেন, আমাদের মধ্যে ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে খেজুরের বাগানও ভাগ করে দিন। রাসূল বললেন, না, তা করা যাবে না। তখন তারা মুহাজিরগণকে বললেন, তাহলে আপনারা আমাদের খেজুর বাগানের পরিচর্যায়

শরীক হোন আমরা আপনাদেরকে ফলনে শরীক করবো, তারা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তা শুনলাম ও মেনে নিলাম। [বুখারী: ২৩২৫]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা হিজরত করার পর মুহাজিরগণ এসে তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যাদের কাছে এসেছি তাদের মত আমরা কাউকে দেখিনি। তারা বেশী থাকলে সবচেয়ে বেশী দানশীল আর কম থাকলে তাতে সহানুভূতির সাথে বন্টন করে দেয়। তারা আমাদেরকে খরচের ব্যাপারে যথেষ্ট করে দিয়েছে। তারা তাদের পেশাতেও আমাদেরকে শরীক করে নিয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি যে, এরা আমাদের সব সওয়াব নিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করছ এবং তাদের প্রশংসা করছ।" [তিরমিযী: ২৪৮৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬]

আনসারদের তৃতীয় গুণ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا

অর্থাৎ 'মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না' এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু নদীর গোত্রের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলিমদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল। অর্থ এই যে, এ বন্টনে যা কিছু মুহাজিরদেরকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাদের এসব জিনিসের প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াটা খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় "যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়।" [বুখারী: ৩৭৯৪]

আনসারগণের চতুর্থ গুণ হচ্ছে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজের অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্রপীড়িত ছিলেন। এটাই মূলত: উত্তম সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে উত্তম সাদাকাহ হচ্ছে, কষ্টে অর্জিত অল্প সম্পদ থেকে দান করা" [আবু দাউদ: ১৬৭৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৫৮, সহীহ ইবনে খুজাইমাহঃ ২৪৪৪, ইবনে হিব্বান: ৩৩৪৬, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪১৪]

وَ يُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهٖ مِسۡکِیۡنًا وَّ یَتِیۡمًا وَّ اَسِیۡرًا

যে সম্পদের প্রয়োজন তার নিজের খুব বেশী তা থেকে দান করতে সক্ষম হওয়া খুব উচু মনের অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তারা খাবারের মহব্বত থাকা সত্বেও তা অন্যদের খাওয়ায়"। [সূরা আল-ইনসান: ৮]

অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "আর সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা সত্বেও তা দান করা"। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭]

সুতরাং দান বা সাদাকাহ করার সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্বেও নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তা দান বা সাদাকাহ করা। আনসারগণ ঠিক এ কাজটিই করতেন। হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের কাছে খাবার চেয়ে পাঠালেন কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি বললেন, এমন কোন লোককি পাওয়া যাবে যে, আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তাকে রহমত করবেন। আনসারী এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান, সুতরাং কোন কিছু বাকী না রেখে সবকিছু দিয়ে হলেও মেহমানদারী করবে। মহিলা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার কাছে তো কেবল বাচ্চার খাবারই অবশিষ্ট আছে। আনসারী বললেন, ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় হলে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, তারপর আমরা বাতি নিভিয়ে দিব, এ রাতটি আমরা কষ্ট করে না খেয়েই কাটিয়ে দিব, যাতে মেহমান খেতে পারে। কথামত তাই করা হলো, সকালে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনসার লোকটি আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "মহান আল্লাহ গতরাত্রে তোমাদের কাণ্ড দেখে হেসেছেন অথবা

বলেছেন, আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।” আর তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল [বুখারী: ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, মুসলিম: ২০৫৪]

আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সফলকাম। আয়াতে বর্ণিত شح শব্দের অর্থ কৃপণতা। [বাগভী] কুরআন ও হাদীসে এর নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছিল। তাদেরকে কৃপণতা অন্যায় রক্ত প্রবাহে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং হারামকে হালাল করতে বাধ্য করেছিল। [মুসলিম: ২৫৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, “ঈমান ও কৃপণতা কোন বান্দার অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না।”
[মুসনাদে আহমাদ ২/৩৪২]
[তাফসীরে জাকারিয়া]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালাহর ২২ নং আয়াতেও সাহাবাদের প্রশংসা করে তাদের উপর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে আরো স্পষ্ট দলীলের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌র বাণীঃ

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ 'হুসনা' বা সবচেয়ে ভাল পরিণামের ওয়াদা করেছেন। [সূরা আননিসাঃ ৯৫]

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেনঃ

ا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা ফাতহ তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের চেয়ে, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সূরা আল-হাদীদঃ ১০]।

দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেনঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

পারস্পরিক তারতম্য সত্বেও আল্লাহ তা'আলা এতে বিস্তারিত এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হোন কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।
এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কুরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। [সা'দী]

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে (শাহাদাত বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহযাব ২৩]

এই আয়াত ঐ সকল সাহাবায়ে-কিরামগণ (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা এই সময়ে নিজ নিজ জীবন কুরবানী দেওয়ার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ঐ সকল সাহাবা (রাঃ)গণও ছিলেন, যাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি; কিন্তু তাঁরা এই অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন যে, আগামীতে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হলে তাতে পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। যেমন আনাস বিন নাযর (রাঃ) এবং আরো অনেকে যাঁরা উহুদ যুদ্ধে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। উক্ত আনাসের দেহে তরবারি, ফলা ও তীরের আঘাত জনিত আশির অধিক যখম ছিল। শাহাদত বরণ করার পর তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ৪/১৯৩)

এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু বলেন, আমার চাচা আনাস, যার নাম আমার নাম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধেই আমি রাসূলের সাথে থাকতে পারিনি। যদি আল্লাহ আমাকে এর পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাহলে আল্লাহ দেখবেন আমি কি করি। তারপর তিনি রাসূলের সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে সা'দ ইবনে মু'আজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায়? তিনি জবাবে বললেন, আমি ওহুদের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। তারপর আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু। প্রচণ্ডরকম যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এমনকি তার গায়ে আশিটিরও বেশী আঘাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। [বুখারী: ৪৭৮৩]

আবার সুরা নিসায় আল্লাহ বলেছেন,

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

অক্ষম নয় এমন বসে-থাকা মু’মিনরা আর জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়; নিজেদের ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে-থাকা লোকেদের উপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে-থাকা লোকেদের তুলনায় আল্লাহ মহাপুরস্কার দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন।
[সুরা নিসা আয়াত ৯৫]

বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ যখন নাযিল হল “মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়” তখন আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো অন্ধ। তখন নাযিল হল “যারা অক্ষম নয়”-এ অংশটুকু। [বুখারীঃ ২৮৩১, ৪৫৯৩, মুসলিমঃ ১৮৯৮]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল তাই করলেন। তারপর বললেনঃ “আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত। তিনি বললেন, সেটা কি? হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। [মুসলিমঃ ১৮৮৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব শত বৎসরের। [তিরমিযীঃ ২৫২৯]

সুরা আম্বীয়ার ১০১ নাম্বার আয়াতে হুসনা লাভকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। [সুরা আম্বীয়ার ১০১]

আবার অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর,

পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী [সুরা হুজরাত আয়াত ৭]
সুরা হুজরাতের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।তারাই সাহাবীগন। [[সুরা হুজরাত আয়াত ১৫]

আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের ঈমাঙ্কে মাপকাঠি সাব্যস্থ করে বলেছেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সুতরাং এরা যদি তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছো, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে আর যদি অস্বীকার করে, তবে তারা ভেদাভেদে লিপ্ত, সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের (অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য) আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। [সূরাঃ আল-বাকারা ১৩৭]

সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ এমন সব লোকই (সাহাবীরা) সত্যিকারের মুমিন (যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ)। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা ও মাগফিরাত এবং সম্মানজনক রিস্ক।(আনফাল আয়াত ৪)

সাহাবায়ে কেরাম এর ইমানের গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপহাস করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, এবং যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ লোকে যেরূপ বিশ্বাস করেছে তোমরাও তদ্রুপ বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলেঃ নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করব? সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ, কিন্তু তা তারা অবগত নয় । [সূরা বাক্বারা; ১৩]

সে যুগের মুনাফেকরা সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। আর বর্তমানের মুনাফিক্বরা বুঝাতে চায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঈমান-ধন থেকেই বঞ্চিত ছিলেন -নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারনতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূখ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সেটা বুঝতেই পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বড় বোকা। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণ তো এই সৌভাগ্যেরই প্রমাণ প্রস্তুত করেছেন। আর এই জন্যেই তাঁরা কেবল পাক্কা মুমিনই নন, বরং তাঁরা হলেন (অপরের) ঈমান নির্ণায়ক মাপকাঠি ও কষ্টিপাথর।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থাৎ, কাফিররা যখন তাদের অন্তরে জিদ ও হঠকারিতা জাগিয়ে তুলল- অজ্ঞতার যুগের জিদ ও হঠকারিতা- তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) জন্য কালিমায়ে তাক্বওয়া তথা সংযমের দায়িত্ব নির্দেশ-বাণী অপরিহার্য (রূপে পালনীয়) ক'রে দিলেন; আর তারাই ছিল এর সবচেয়ে বেশি হকদার ও যোগ্য অধিকারী। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। [সূরা ফাৎহ: ২৬]

রাসুল (সা.)এর হাদীস থেকে সাহাবা কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা

সাহাবিদের মর্যাদা এবং ফজিলত সম্পর্কে এসেছে অসংখ্য হাদিস। এখানে মাত্র উনাদের শানে কিছু হাদিস তুলে ধরলাম।
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ)فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ(، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ

''তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।'[নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৮৭]

বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদরে পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত। (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ) (বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪)

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ

''তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে না।''[বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন:

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা বা অবজ্ঞা করেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না।

(৪) সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। ভুল বুঝাবুঝি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ, মামলা বা যুদ্ধ হতে পারে। শুধু যুদ্ধ বা বিরোধের কারণে কাউকে অপরাধী বলা যায় না।
যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক সত্য। তবে সেগুলিতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ক ইতিহাস লেখা হয়েছে ঘটনার প্রায় ২০০ বৎসর পর শীয়া মতবাদ প্রভাবিত আববাসী শাসনামলে শীয়াগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কুরআন ও হাদীস সাহাবীগণের মর্যাদা ও সততা নিশ্চিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদের মর্যাদা সম্মন্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم

অর্থাত-সাবধান!তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাঁদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও

বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে"। [তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হা. ২২৮৪, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ.৮৭, আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, হা.৯৯২]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

অর্থাত-তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে,তবেও তাঁদের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ(এক মুদ=১ রতল। আল্লামা শামী(রাঃ) বয়ান করেছেন যে, এক মুদ্দ ২৬০ দিরহামের সমপরিমাণ। দ্রষ্টব্যঃ আওযানে শরিয়্যাহ)আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমতূল্য হবেনা।
[সহিহ বুখারী-হাদিস নং ৩৭১৭]

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ)হতে বর্ণিতঃ রাসুলুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন-

من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

অর্থাৎ -"যারা আমার সাহাবীদেরকে গালী দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর,ফেরেস্তাদের,এবং জগতবাসীর অভিশাপ বর্ষিত হোক। [তাবরানী ফিল কাবির, হা.১২৭০৯]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর "আল-ওয়াসিয়্যাহ" কিতাবে বলেন:

،وَنُقِرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :"وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ"، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَيُحِبُّهُمْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، وَيُبْغِضُهُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ شَقِيٍّ.

"এবং আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম আবূ বাকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; কারণ আল্লাহ বলেছেন: "এবং অগ্রগামীগণ অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে"। (সুরা ওয়াকিয়া)

আর (সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামগ্রহণে) যে যত বেশি অগ্রবর্তী তাঁর মর্যাদা তত বেশি। আর প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন তাঁদেরকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক হতভাগা মুনাফিক তাঁদেরকে বিদ্বেষ করে।' [ইমাম আবূ হানীফ, আল-ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৭৭.]
অনেক সময় আবেগ-তাড়িত মুমিন পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গের নেককাজের বাড়াবাড়ি দেখে তাকে কোনো সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী বলে মনে করতে থাকেন। এভাবে শীয়াগণ ও অন্য অনেকে তাবিয়ী উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ)-কে সাহাবী মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে উত্তম বলে মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দুর্বলতা থেকে এরূপ ধারণার জন্ম হয়। মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি কোনোভাবেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যের সাথে কোনো নেককর্মের তুলনা করতে পারেন না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য, ঈমানের সাথে দু চোখ ভরে তাঁকে দেখা, তাঁর মুখের কথা শোনার বা তাঁর সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদার কর্ম কি আর কিছু হতে পারে? তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াতের যে গভীরতা অর্জন হয় তা কি আর কোনোভাবে সম্ভব? আর মুমিনের আমলের মর্যাদা শুধু বাহ্যিক পরিমাপ দ্বারা হয় না, বরং ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পরবর্তীদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা লক্ষ লক্ষ টন সম্পদ দান সাহাবীগণের অর্ধ মুদ্দ বা ২০০/৩০০ গ্রাম সম্পদ দানের সমকক্ষ হতে পারে না। আর এজন্যই পরবর্তী কোনো বুজুর্গ অনেক বেশি আমল করলেও মর্যাদায় কোনো অতি সাধারণ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারেন না। পরবর্তী কোনো প্রজন্মের কোনো বুজুর্গকে কোনো সাহাবীর সমকক্ষ বা উত্তম বলে মনে করলে মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর এবং তাঁর সাহচর্যের অবমূল্যায়ন করা হয়।

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

اكرموا أصحابى فإنهم خياركم

অর্থাৎ-তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব।
[মুসনাদে আহমাদ, খ.১, পৃ.১১২, তাহকীক, মেশকাত, খ.৩, পৃ.১৬৯৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কোনো তাবিয়ীকে বা অন্য কোনো বুজুর্গকে মুআবিয়া (রা) বা কোনো সাহাবীর সাথে তুলনা করার প্রবণতার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন:

مقام أحدهم مع رسول الله ﷺ ساعة واحدة ،خير من عمل أحدنا جميع عمره ،وإن طال

''রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম, আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।''[মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ মাক্কী (৫৬৮ হি), মানাকিবু আবী হানীফাহ, পৃষ্ঠা ৭৬।]

হযরত আবু বুরদাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন যে

عن أبى بردة رضي الله عنه قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم – النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ،وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

.

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে,তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের(সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। [মুসলিম শরীফ, হা.২৫৩১]

ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ(সাঃ)ইরশাদ করেছেনঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم :عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ হা.৪৬০৭,তিরমিযী-২৮৯১,ইবনে মাজাহ]

রাসুলে কারীম(সাঃ) সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

ستفترق أمتی ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فی النار إلا واحدة : قالوا من هی يا رسول الله !قال :ما أ نا عليه وأصحابی

অর্থঃ“ অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর(৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর ? উত্তরে নবী(সাঃ) বললেন,যে নীতি,তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন। [তিরমিজী শরীফ, হা.২৬৪০, ইবনে মাজা, হা.৪৭৯, মুসনাদে আহমদ খ.৪, পৃ.১০২, আল-মুসতাদরাক, খ.১, পৃ.১২৮]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار

অর্থ: ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারী সাহাবীদের মহব্বত এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো, আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ। [বোখারী শরীফ, খ.৭, পৃ.১১৩, মুসলিম শরীফ, হা.৭৪, ইমান অধ্যায়]

রাসূল স. ইরশাদ করেন,

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني ،والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأي من رآني وصاحبني

অর্থ: তোমরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমাকে যারা দেখেছে এবং আমার সংস্পর্শে থেকেছে তারা বর্তমান থাকবে। আল্লাহর শপথ, তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা আমার সাহাবী ও সংস্পর্শ অবলম্বনকারীদেরকে দেখেছে।
[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১২, পৃ.১৭৮, ত্ববরানী ফিল কাবির, খ.২২, পৃ.৮৫, ফাতহুল বারী, খ.৫, পৃ.৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসুলুলুল্লাহ্ (সা:) ইরশাদ করেছেন-

"من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين "

অর্থাৎ -"যারা আমার সাহাবীদেরকে গালী দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর, মালাইকাদের এবং জগতবাসীর অভিশাপ বর্ষিত হোক। [তাবরানী ফিল কাবির: ১২৭০৯]

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা:) ইরশাদ করেছেন যে,

عن أبي بردة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের (সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। [মুসলিম শরীফ: ২৫৩১]

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন,

اكرموا أصحابي فإنهم خياركم

অর্থাৎ- তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১১২]

ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা:) ইরশাদ করেছেনঃ

قال النبي صلى الله عليه وسلم :عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। [মুসনাদে আহমদ: ১৭৬০৬, আবু দাউদ: ৪৬০৭, তিরমিযী: ২৮৯১]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন,

آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار

অর্থ: ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারী সাহাবীদের মহব্বত এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো, আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ। [বোখারী শরীফ: ৩৭৮৪, মুসলিম শরীফ: ৭৪. নাসাঈ: ৫০১৯]

রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন,

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني ،والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأي من رآني وصاحبني

অর্থ: তোমরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমাকে যারা দেখেছে এবং আমার সংস্পর্শে থেকেছে তারা বর্তমান থাকবে। আল্লাহর শপথ, তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা আমার সাহাবী ও সংস্পর্শ অবলম্বনকারীদেরকে দেখেছে।
[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১২/১৭৮, ত্ববরানী ফিল কাবির-২২/৮৫, ফাতহুল বারী-৫/৭]

সাহাবীগণ বিষয়ে ইমাম আযমের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন:
‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাঁদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। তাঁদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে বিদ্বেষ করা বা ঘৃণা করা কুফর, নিফাক ও অবাধ্যতা। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর আবু বাকর সিদ্দিক (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি এবং তা সমগ্র উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে। তারপর উমার ইবন খাত্তাব (রা), তারপর উসমান (রা) এবং তারপর আলী (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি। এরাই হলেন

খুলাফায়ে রাশেদীন, (সুপথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ) ও আয়িম্মাহ মাহদিয়ীন (মাহদী ইমাম বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামবৃন্দ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। এরা হলেন: আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ (ইবন আবী ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবন যাইদ ইবন আমর), আব্দুর রহমান বিন আ'ওফ এবং আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (রাঃ)। আর এ শেষোক্তজন এ উম্মতের আমীন (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইর উপর সন্তুষ্ট হোন। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পূত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নিফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের 'সালাফ সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী । [তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৮-১৯]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে আল্লাহর ওয়াস্তে ও আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই ভালোবাসেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, যারা তাদেরকে ভালোবাসবেন, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন ও তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হবেন তারাই সফলকামী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যারা তাদেরকে অপছন্দ করবেন, তাদেরকে গাল-মন্দ করবেন, শত্রুদের দলে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন ও তাদের মর্যাদার বিপরীত কিছু বলবেন তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

«آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

"ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারগণকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর আলামত হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা"।[মুত্তাফাকুন 'আলাইহি, সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, বাব হুব্বুল আনসার মিনাল ঈমান, ৩/৩৯, হাদীস নং ৩৭৮৪]

এখানে যেহেতু আনসারগণের ভালোবাসা প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে মুহাজিরগণের প্রতি ভালোবাসা আরও অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। যেহেতু তারা সর্বদিক বিবেচনায় তাদের (আনসারদের) চেয়ে উত্তম। এছাড়া তারাও আল্লাহকে সাহায্য করেছেন যেমন আনসারগণ করেছেন; সেহেতু তারাও আনসার হিসেবে গণ্য। [আল-জাওয়াবুস সহীহ, ২/২৬৭]

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসার যেসব মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসার দ্বারা যে কেউ সেসব মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে; যেহেতু তারা হলেন সর্বোত্তম মানুষ।

আবু নু'আইম তার "হিলইয়া" গ্রন্থে বিশর ইবন হারিস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমার অন্তরে যে আমলটি সবচেয়ে বেশি মজবুত ও কার্যকর মনে হচ্ছে তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ভালোবাসা'।আবু নু'আইম তার "হিলইয়া" [হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/৩৩৮]

ইমাম ত্বহাবী রহ. তার আক্বীদার কিতাবে বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি, তাদের কাউকে ভালোবাসায় আমরা বাড়াবাড়ি করি না, আবার কারও থেকে ভালোবাসা ছিন্নও করি না (সবাইকে ভালোবাসি)। আমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি ও তাদেরকে ঘৃণা করি যারা সাহাবীগণের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষপোষণ করবে এবং তাদেরকে খারাপভাবে উল্লেখ করবে। সাহাবীগণকে ভালোবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাদেরকে অপছন্দ করা কুফুরী, নিফাকী, পাপ ও অবাধ্যতা।'[আক্বীদাতুত ত্বহাবীয়া মা'আ শরহে ইবন আবিল 'ইয্য, পৃষ্ঠা ৪৬৭]

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সমালোচনার ভয়ঙ্কর পরিণতি

নবীজি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের প্রতি মুহব্বত রাখা, তাঁদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। তাঁদের ইত্তেবা বা অনুসরণ করা –ওয়াজিব। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া, সমালোচনা করা, নাকিছ বা অপূর্ণ বলা সম্পূর্ণ গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। এটাই আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা বা বিশ্বাস। এর বিপরীত আক্বীদা পোষণ করা বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের বিপরীতে অবস্থান গ্রহনের নামান্তর।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একটি মূলনীতি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের ব্যাপারে তাদের অন্তর এবং বাক-যন্ত্র পুত-পবিত্র ও সংযত থাকবে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর প্রতিও তারা আমল করবে, রাফেযী-খারেজীদের ভ্রষ্ট তরীকা থেকে তারা মুক্ত থাকবে। কিতাব ও সুন্নায় সাহাবায়ে কিরামের যে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আহলে সুন্নাত তা মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে যে, তারাই যুগের সর্বোত্তম প্রজন্ম। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক । তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে, আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে । [বুখারী:৫৯৮৬ ই:ফা:]

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা কুফরী।

٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُاللهِ و المَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি আঁমার সাহাবীদের নিয়ে সমালোচনা করে তার উপর আল্লাহর,ফেরেস্তাদের এবং সকল মানব জাতির অভিসম্পাদ।

[তাবরানী কৃত মুজামুল কাবির, ১২/১৪২, হাঃ ১২৭০৯,ফাযায়েলে সাহাবা, আহমাদ বিন হাম্বলকৃত, হাদীস নং-৮ , মুজামুল আউছাতে আবু সাঈদ খুদরী (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সুত্রে, ৫/৯৪ হাঃ ৪৭৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৬/৪০৫, হাঃ ৩২৪১৯]

ইমাম মালেক রহ. বলেন,

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

অর্থ: যারা সাহাবাদের ব্যপারে কুৎসা রটনা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় এরা মূলত: রসূল (স.) এর বিরুদ্ধেও কুৎসা রটাতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। তাই তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে এবং বলেছে, অমুক সাহাবী নিকৃষ্ট লোক ছিল, অমুকে এমন ছিল তেমন ছিল ইত্যাদি। রাসূল স. যদি নেককার ও সৎ হয়ে থাকেন, তবে তাদের নিকট তার সাহাবীরাও সৎ ও নেককার বিবেচিত হতো। [আস-সরিমূল মাসলূল, পৃ. ৫৫৩]
হাদিস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে-

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنہ قال قال
رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلّم اذا رايتم
الذين يسبّون اصحابى فقولوا لعنۃ اللہ على
شرّكم–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যখন
তোমরা এ ধরনের লোক দেখবে, যারা আঁমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তখন তাদের উদ্দ্যেশে বলে
দাও,তোমাদের অনিষ্টের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক"। [তিরমিযী ২য় খন্ড-২২৫ পৃঃ]
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام

অর্থাৎ যদি কাউকে রাসূল স. এর কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৮, পৃ.১৪২]
হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ :مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আঁমার সাহাবীকে মন্দ বলে,তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।

[মুসনাদুল বাজ্জার,হাদীস নং- ৫৭৫৩, আলমুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৪৭৭১]

আবূ যুর'আ রহ. বলেন,

فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم انه زنديق ، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ،والقرآن حق ،وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم اولى وهم زنادقة

তোমরা যখন কাউকে কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখ, তখন বিশ্বাস করে নাও যে, সে যিন্দীক ও বির্ধমী। তা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল স. সত্য নবী, পবিত্র কুরআন সত্য; কুরআন হাদীস তথা পুরা দ্বীন যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার প্রথম যোগসূত্র হলেন সম্মানিত এ জামাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবাগণের সমলোচনা করবে, সে আমাদের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সমালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেঅগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চায়। অর্থাত্ ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং এজাতীয় লোকদের সমালোচনা করা উত্তম বরং এরা হলো যিন্দিক।

[আল-কিফায়া, খতীব বাগদাদী, পৃ.৯৭]

ইমাম আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা হতে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, কোন সাহাবী রাযি. এর পূত- পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই।

[উলূমুল হাদীসঃ ২৬৪]

আরেকটি হাদিসে এসেছে,

عن عبد اللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی لا
تتخذو انتم عرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی
احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,‘আঁমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো,আল্লাহকে ভয় কর।আঁমার পরবর্তীকালে তোমরা তাঁদের সমালোচনার নিশানায় পরিণত করো না। কারণ,যে তাঁদের ভালোবাসবে সে আঁমার মুহাব্বতেই তাঁদের ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের অপছন্দ করবে সে আঁমাকে অপছন্দ করার ফলেই তাঁদের অপছন্দ করবে। আর যে তাঁদের কষ্ট দেবে সে আঁমাকেই কষ্ট দেবে। আর যে আঁমাকে কষ্ট দেবে সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।’
[তিরমিযী : ৪২৩৬,সহীহ ইবনে হিব্বান-৭২৫৬]

সাহাবাদের মর্যাদা সম্মন্ধে নবীজি (ﷺ) কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم

অর্থাৎ-সাবধান!তোমরা আঁমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আঁমার পরে তোমরা তাঁদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আঁমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাঁদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আঁমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে”।
[তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২২৮৪ *৩. মুসনাদে আহমদ,৪র্থ খন্ড,পৃ:৮৭ *৪. আস-সুন্নাহ,ইবনে আবি আসেম, হাদিস নং ৯৯২]
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

من سب نبيًّا فاقتلوه ومن سب أصحابى فاضربوه

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি নবীকে [ছাব্ব] মন্দ বলে,তাকে হত্যা কর। আর যে সাহাবীকে [ছাব্ব] মন্দ বলে তাকে প্রহার কর।
[জামেউল আহাদীস,হাদীস নং-২২৩৬৬]

এবার আমরা দেখি অভিধানে ছাব্ব এর অর্থ কি?

অভিধানে ছাব্ব সরাসরি গালিকে বলে না, বরং গালির দিকে ধাবমান নিন্দাবাদকে বলে।

[মুজামুল ফারকুল লাগাবিয়্যাহ, নং-১১৭৪]
ইবনে তাইমিয়া বলেন-যে কথা সমাজে খারাপ ও দোষ এবং ত্রুটি হিসেবে বলা হয় তা'ই ছাব্ব।
[আস সারেমূল মাসলূল-৫৩৪]

আরবীতে গালি বুঝাতে ব্যবহৃত হয় شتم শব্দ। "শাতাম" অর্থ হল গালি। ছাব্ব অর্থ সরাসরি গালি নয়। বরং যথার্থ অর্থ হল,মন্দ বলা,খারাপ বলা ইত্যাদি।

হাদীসে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মন্দ বলা, তাদের কটুক্তি করা, তাদের সমালোচনা করতে পরিস্কার নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "শাতাম" তথা গালি শব্দ ব্যবহার না করে ব্যবহার করেছেন "ছাব্ব" তথা মন্দ বলা।

অর্থাৎ সাহাবাগণকে মন্দ বলা, তাদের নিন্দাবাদ করাই বৈধ নয়। গালি দেয়াতো বহু দূরের বিষয়।
হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত।রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন,
'জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না,যে আঁমাকে দেখেছে অর্থাৎ আঁমার সাহাবিরা কিংবা আঁমাকে যারা দেখেছে তাদের দেখেছে অর্থাৎ তাবেয়িরা।'
[তিরমিজি : ৩৮০১]

ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

قال النبی صلی الله علیه وسلم :علیکم بسنتی وسنة خلفاء الراشدین المهدین

অর্থঃ আঁমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন (রা:) এঁর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।
[আবু দাউদ হাদিস-৪৬০৭,তিরমিযী-২৮৯১, ইবনে মাজাহ, ৪২]

ইমাম ইবনে হুমাম রহ. বলেন-
আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা হল, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে পূত ও পবিত্র মনে করা, তাঁদের উপর আপত্তি উত্থাপন থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব।

[মুসায়েরা- ১৩২পৃঃ]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام

অর্থাৎ যদি কাউকে রাসূল স. এর কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো।
[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৮, পৃ.১৪২]

আবূ যুর'আ রহ. বলেন,

فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم انه زنديق ، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ،والقرآن حق ،وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم اولى وهم زنادقة

■ বলেন, তোমরা যখন কাউকে কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখ, তখন বিশ্বাস করে নাও যে, সে যিন্দীক ও বিধর্মী। তা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল স. সত্য নবী, পবিত্র কুরআন সত্য: কুরআন হাদীস তথা পুরা দ্বীন যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার প্রথম যোগসূত্র হলেন সম্মানিত এ জামাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবাগণের সমলোচনা করবে, সে আমাদের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সমালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেঅগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চায়। অর্থাত্ ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং এজাতীয় লোকদের সমালোচনা করা উত্তম বরং এরা হলো যিন্দিক।
[আল-কিফায়া, খতীব বাগদাদী, পৃ.১৭]

■ ইমাম আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা হতে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, কোন সাহাবী রাযি. এর পূত- পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই।

[উলূমুল হাদীসঃ ২৬৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা:) থেকে বর্ণিত,

عن عبد الله بن مغفلرض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم......... من آذاهم فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله و من آذى الله فيوشك أن يأخذه) ترمذي ص

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে আঁমার সাহাবীদেরকে কষ্ট দিল সে যেন আঁমাকে কষ্ট দিল; যে আঁমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল; যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।
[তিরমিযী-২য় খন্ড,২২৫পৃ: হাদিস নং-৩৭৯৭,মুসনাদে আহমদ-হাদিস নং ১৯৬৬৯ , ১৯৬৪১,মিশকাত-৫৫৪ পৃ:]

সকল সাহাবা রাযি. এর সঙ্গে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের মাঝে পারস্পরিক যে সকল ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে তা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা, শ্রবণ করা এবং করানো হতে বিরত থাকা এবং তাঁদের সুনাম সুখ্যাতি আলোচনা করা, তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি প্রর্দশন থেকে বেচে থাকা ফরয।(শরহে আকীদায়ে সাফারানীঃ ২/৩৮৬)

সাহাবীগণের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের অবস্থান:

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের কিছু বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ইমামের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সালাফে-সালেহীনের এসব বক্তব্যের সারমর্ম নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

২. সব সাহাবীই রাসূল স. এর প্রিয় ছিলেন।

৩. সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দেয়া, তাদের সম্পর্কে অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার, তাদের সমালোচনা, তাদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম।

এজাতীয় কাজের কারণে একজন মুসলিম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভূক্ত হয়।

৪. সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম রা. এর ভালো গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা উচিৎ।

৫. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, তাদের প্রতি কুধারণা, এবং তাদের কুৎসা রটনা করা বিধর্মী যিন্দিকদের কাজ।

৬. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ও চাহিদা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ বেইমানীর আলামত।

৭. অনেক সময় সাহাবীদেরকে গালা-গালি করার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

৮. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সমালোচনাকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি।

ফজল বিন যিয়াদ বলেন,

وَقَالَ الْفَضْلُ بن زياد :سمعت أبا عبد الله يسأل عَنْ رَجُلٍ تَنَقَّصَ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أيقال له رافضي؟ فقال :إنه لم يجترئ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَلَهُ خَبِيئَةُ سُوءٍ، مَا انْتَقَصَ أحد أحداً من الصحابة إِلَّا وَلَهُ دَاخِلَةُ سُوءٍ.

ফজল বিন যিয়াদ হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহঃ থেকে শুনেছেন,
তাকে একজন প্রশ্ন করল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে, যে হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এবং হযরত আমর বিন আস রাঃ এর ব্যাপারে মন্দ বলে। লোকটিকে কি রাফেজী বলা হবে?

তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ বললেন, অন্তর কলুষিত এবং খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া সে দু’জনের প্রতি এ দুঃসাহস দেখায়নি। আর অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন সাহাবীর সমালোচনা করেনি। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৮, ১৪৯, ইফাবা-৮/২৬৫]
আবার সালাফে সালেহীনদের একজন বলেন,

،وقال بعض السلف :بينما أَنَا عَلَى جَبَلٍ بِالشَّامِ إِذْ سَمِعْتُ هَاتِفًا يَقُولُ :مَنْ أَبْغَضَ الصِّدِّيقَ فَذَاكَ زِنْدِيقٌ وَمَنْ أبغض عمر فإلى جهنم زمراً، وَمَنْ أَبْغَضَ عُثْمَانَ فَذَاكَ خَصْمُهُ الرَّحْمَنُ، وَمَنْ أبغض علياً فَذَاكَ خَصْمُهُ النَّبِيُّ، وَمَنْ أَبْغَضَ مُعَاوِيَةْ سَحَبَتْهُ الزبانية، إلى جهنم الحامية، يرمى به في الحامية الْهَاوِيَةْ

যখন আমি শামের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম তখন এক (অদৃশ্য) ঘোষককে বলতে শুনলাম-সিদ্দীকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী হল যিনদীক, ধর্মদ্রোহী। উমরের প্রতি বিদ্বেষীর ঠাঁই হল জাহান্নাম। উসমান বিদ্বেষীর প্রতিপক্ষ হলেন আল্লাহ। আলী বিদ্বেষীর প্রতিপক্ষ হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যে মুয়াবিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে (জাহান্নামের) ফেরেশতারা তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। উত্তপ্ত জাহান্নামের দিকে এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে উত্তপ্ত অগ্নি গহ্বরে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৮-১৪৯, ১৪৯-১৫০, ইফাবা-৮/২৬৫-২৬৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহঃ লিখেছেনঃ

ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع

চারজন খলীফায়ে রাশেদের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবা রাঃ খাইরুন নাস। তাদের ব্যাপারে সামান্য খারাবী বর্ণনা করাও কারো জন্য জায়েজ নয়। কোন একজন সাহাবীর দোষ এবং ত্রুটি বর্ণনা করার সুযোগ নেই। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজ করে, তাহলে শাসকের দায়িত্ব হল, তাকে শিক্ষা দেয়া এবং তাকে শাস্তি দেয়া। তাকে ক্ষমা করা যাবে না, বরং তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে। যদি সে তওবা না করে সমালোচনার উপর অটল থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার আবার কড়া শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে আজীবনের জন্য বন্দী করবে যতক্ষণ না সে মারা যায় বা তওবা করে। [আসসারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল-৫৭৩, ৫৬৮]

যে কোন সাহাবীর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজের মত ন্যায়পরায়ন শাসক পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর ব্যাপারে সমালোচনাকারীকে চাবুক মারতেন। যেন উক্ত ঘৃণিত কাজ থেকে ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে একাজ করার সাহস না পায়।

সাহাবীগণের মর্যাদা ও সম্মানে শীয়াদের বিদ্বেষ ও খন্ডন

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) তাঁর আল-ফিকহুল আকবর থেকে কিছু কথা তুলে ধরছি লেখকের নিজের ভাষায়-

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিজন ও বংশধরের প্রতি এ ভালবাসা ও ভক্তি কখনোই তাঁর সহচর ও সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু শীয়াগণ পরিবার ও বংশধরের ভালবাসার নামে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয় এবং সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষকে ঈমানের অংশ বানিয়ে নেয়। তারা ইহূদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্য: ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়; কারণ কেবলমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাঊযূ বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দু-চার জন মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু সুপরিচিত সাহাবীগণের সততায় সন্দেহ পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যর্থতার দাবি করা হয়। একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ 'সততা' অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের 'সততা' অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে কুরাআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবূ বকর, উমার, উসমান, আবূ হুরাইরা, আমর ইবনুল আস, মুআবিয়া, আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বা অন্য কোনো সাহাবী সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন।

শীয়াগণ কাউকে দেবতা ও কাউকে দানব বানিয়েছেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। মানবীয় দুর্বলতার সাথে সততার কোনো বৈপরীত্য নেই। সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন;

মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সাহচর্যে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সততা ও বেলায়াত তাঁরা অর্জন করেছিলেন। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তাঁর সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর। কাজেই নুবুওয়াতে বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসই নিশ্চিত করেছে কুরআন ও হাদিস। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) তাঁর আল-ফিকহুল আকবর ইসমাতুল আম্বিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত, কিতাবে-

[** তথ্যসূত্রঃ আল-ফিকহুল আকবর ইসমাতুল আম্বিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)]

(১) কুরআনে বারবার সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁদের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও পরের সকল সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ বলেন:

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।’’[সুরা হাদীদ , আয়াত ১০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

‘‘কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।’’[হুজুরাত, আয়াত ৭ ।]

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ-ই মহাসাফল্য।"[তাওবা: ১০০ আয়াত।]

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা ও জান্নাতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট 'বাইয়াত' গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[সূরা ফাৎহ: ১৮ আয়াত।]

তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় আল্লাহ বলেন:

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।"[সূরা তাওবা: ৮৮ আয়াত।]

(৪) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُم، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ

''তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।''[নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৮৭; মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ১/১৯৩, ২৬৬, ২৬৮; তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/১৫০; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১১/৩৪১; আবদ ইবনু হুমাইদ, মুসনাদ, পৃ: ৩৭। হাদীসটির সনদ সহীহ]

(৫) মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

''তাদের পরে যারা আগমন করল তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু।''[সূরা হাশর: ১০ আয়াত।]

তাহলে আমরা এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে যে, কুরআনুল কারীমের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং তাঁদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা । তাঁদের জন্য অন্তরে কোনো হিংসা বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ

''তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে না।''[বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩ (ফাযাইলু আসহাবিন নাবিয়্যি, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি: লাও কুনতু মুত্তাখিযান....); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭ (কিতাব ফাযাইলিস সাহাবা, বাবু তাহরীমি সাবিবস সাহাবা)]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন:

(১) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।

(২) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(৩)) সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। ভুল বুঝাবুঝি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ, মামলা বা যুদ্ধ হতে পারে। শুধু যুদ্ধ বা বিরোধের কারণে কাউকে অপরাধী বলা যায় না। অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী।

(৪) কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা বা অবজ্ঞা করেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না।

যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক সত্য। তবে সেগুলিতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ক ইতিহাস লেখা হয়েছে ঘটনার প্রায় ২০০ বৎসর পর শীয়া মতবাদ প্রভাবিত আববাসী শাসনামলে শীয়াগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কুরআন ও হাদীস সাহাবীগণের মর্যাদা ও সততা নিশ্চিত করেছে। এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের অযুহাতে তাঁদের কারো নামে কুৎসা রটনা বা বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থ কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনা জনশ্রুতির কারণে বাতিল করে দেওয়া।

আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কিন্তু কার কী ভূমিকা তা আমরা এতদিন পরে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে পারব না। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমরা তাঁদের পরিপূর্ণ সততা ও বেলায়াতে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি যে, তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ভুল বুঝাবুঝি ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কারণেই ঘটেছে। এতে তাঁদের তাকওয়া ও বেলায়াত (আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদা) ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি।

উপরের বিষয়গুলোই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ‘‘আল-ওয়াসিয়্যাহ’’ পুস্তিকায় এ বিষয়ে আরো বলেন:

وَنُقِرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى" :وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ"، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَيُحِبُّهُمْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، وَيُبْغِضُهُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ شَقِيٍّ

‘‘এবং আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম আবূ বাকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; [আল-ওয়াসিয়্যাহ]

কারণ আল্লাহ বলেছেন:

‘‘এবং অগ্রগামীগণ অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে’’[সূরা ওয়াকিয়া: ১০-১২ আয়াত।]।

আর (সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামগ্রহণে) যে যত বেশি অগ্রবর্তী তাঁর মর্যাদা তত বেশি। আর প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন তাঁদেরকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক হতভাগা মুনাফিক তাঁদেরকে বিদ্বেষ করে।’’[ইমাম আবূ হানীফ, আল-ওয়াসিয়্যাহ]

অনেক সময় আবেগ-তাড়িত মুমিন পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গের নেককর্মের আধিক্য দেখে তাকে কোনো সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী বলে মনে করতে থাকেন। এভাবে শীয়াগণ ও অন্য অনেকে তাবিয়ী উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ)-কে সাহাবী মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে উত্তম বলে মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দুর্বলতা থেকে এরূপ ধারণার জন্ম হয়। মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি কোনোভাবেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যের সাথে কোনো নেককর্মের তুলনা করতে পারেন না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য, ঈমানের সাথে দু চোখ ভরে তাঁকে দেখা, তাঁর মুখের কথা শোনার বা তাঁর সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদার কর্ম কি আর কিছু হতে পারে? তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াতের যে গভীরতা অর্জন হয় তা কি আর কোনোভাবে সম্ভব? আর মুমিনের আমলের মর্যাদা শুধু বাহ্যিক পরিমাপ দ্বারা হয় না, বরং ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পরবর্তীদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা লক্ষ লক্ষ টন সম্পদ

দান সাহাবীগণের অর্ধ মুদ্দ বা ২০০/৩০০ গ্রাম সম্পদ দানের সমকক্ষ হতে পারে না। আর এজন্যই পরবর্তী কোনো বুজুর্গ অনেক বেশি আমল করলেও মর্যাদায় কোনো অতি সাধারণ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারেন না। পরবর্তী কোনো প্রজন্মের কোনো বুজুর্গকে কোনো সাহাবীর সমকক্ষ বা উত্তম বলে মনে করলে মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর এবং তাঁর সাহচর্যের অবমূল্যায়ন করা হয়।

এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কোনো তাবিয়ীকে বা অন্য কোনো বুজুর্গকে মুআবিয়া (রা) বা কোনো সাহাবীর সাথে তুলনা করার প্রবণতার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন:

مقام أحدهم مع رسول الله ﷺ ساعة واحدة ،خير من عمل أحدنا جميع عمره ،وإن طال

''রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম, আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।''[মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ মাক্কী (৫৬৮ হি), মানাকিবু আবী হানীফাহ]

এ অর্থে অন্য এক বুজুর্গ বলেন:

غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله ﷺ أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز

''রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে মুআবিয়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা প্রবেশ করেছে তাও উমার ইবন আব্দুল আযীযের আমলের চেয়ে উত্তম।''[ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ (কুরতুবা: শামিলা) ৬/১৪০]

ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ বিচারপতি সায়িদ নাইসাপূরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন:

،روي عن ابن المبارك رحمه الله قال :كنت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - مع نوح بن أبي مريم فقام، فقال :يا أبا حنيفة !إني قد كتبتُ هذه الكتبَ، وأريد أن أكتب من الآثار، فعمَّنْ أحمل؟ فقال :عن كل عدل في هواه إلا الرافضة، فإن أصل عقدِهم تضليلُ أصحاب النبي ﷺ .فَضِّلْ أبا بكر وعمر، وأحِبّ عليّا وعثمانَ، ولا تحمِلِ الآثار عمن لا يُحبّهم

"আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূ হানীফা (রহ.)-এর নিকট ছিলাম। আমার সাথে নূহ ইবন আবী মরিয়ম ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: হে আবূ হানীফা, আমি তো এ সকল (ফিকহী) কিতাব লেখাপড়া করলাম। এখন আমি হাদীস শিক্ষা করতে চাই। কার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করব? আবূ হানীফা বলেন: সকল সৎ-বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখবে, যদিও তার মধ্যে কিছু বিদআত থাকে। তবে শীয়া-রাফিযীদের থেকে কিছুই লেখা যাবে না। কারণ তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণকে বিভ্রান্ত বলে দাবি করা। তুমি আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-কে সাহাবীগণের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করবে এবং আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে ভালবাসবে। যারা তাঁদেরকে ভালবাসে তারা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে হাদীস শিখবে না।"[আল-ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ১৫৮]

ইমাম আবূ হানীফার এ কথাটি অনুধাবনের জন্য একটি বিষয় চিন্তা করলে দেখা যায় । যদি ইহূদীদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মূসার (আঃ) সহচরগণ। যদি খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী ঈসার (আঃ) হাওয়ারী-সহচরগণ। আর যদি শীয়াদেরকে প্রশ্ন করা হয় নিকৃষ্ট-ঘৃণ্যতম মানুষ কারা? তবে তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহচরগণ!!

শীয়াদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে ভাল মানুষ কারা? তারা বলবেন: আলী (রা)-এর সাথীগণ। তাদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ!!

আমাদের উচিত কাউকে ভালবাসার অতি স্বাভাবিক প্রকাশ তার সাথে জড়িত সকলকে ভালবাসা ও সম্মান করা। এমনকি তাদের কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলেও অজুহাত খুঁজে তা বাতিল করতে চেষ্টা করা। কারণ প্রিয়তমের সাথীদেরকে খারাপ কল্পনা করতে মন মানে না। আর কারো সঙ্গীসাথীকে সর্বোচ্চ ঘৃণা করার সুনিশ্চিত অর্থ ঐ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা না থাকা। কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীদেরকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করা ও তাঁদেরকে ঘৃণা করা যাদের ধর্মের মূল ভিত্তি তাঁদের থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাদীস বা দীন শিক্ষা করা কি সম্ভব?

সাহাবীগণ বিষয়ে ইমাম আযমের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسُولِ الله ﷺ، وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم؛ وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نُذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ ,وَحُبُّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ .وَنُثْبِتُ الْخِلافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلاً لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَضِيلاً لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ

الأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ ، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ .وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ ،رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ :أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ .وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ -مِنَ النِّفَاقِ .وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ -أَهْلُ الْخَيْرِ وَالأَثَرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ .لا يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ ،

‘‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাঁদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। তাঁদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে বিদ্বেষ করা বা ঘৃণা করা কুফর, নিফাক ও অবাধ্যতা। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর আবু বাকর সিদ্দিক (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি এবং তা সমগ্র উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে। তারপর উমার ইবন খাত্তাব (রা), তারপর উসমান (রা) এবং তারপর আলী (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি। এরাই হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, (সুপথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ) ও আয়িম্মাহ মাহদিয়ীন (মাহদী ইমাম বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামবৃন্দ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। এরা হলেন: আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা’দ (ইবন আবী ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবন যাইদ ইবন আমর), আব্দুর রহমান বিন আ’ওফ এবং আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (রাঃ)। আর এ শেষোক্তজন এ উম্মতের আমীন (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইর উপর সন্তুষ্ট হোন। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পূত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নিফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের ‘সালাফ সালিহীন’ (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।’’[তাহাবী, আল-আকীদাহ]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়াদের মিথ্যা তোহমৎ:

কেউ যদি আপনার মা বা মেয়েকে অশ্লীল মেয়ে বলে গালি দেয় তখন আপনি কি ব্যক্তিত্ব ও মানবতার কারণে তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন? অথচ এই অভিশপ্ত শিয়ারা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-র শানে এই ধরনের কথা বলে। যেখানে আল্লাহ স্বয়ং উনার পবিত্রতা ঘোষণা দিয়েছে কুরআনে। কিন্তু এই অভিশপ্ত শিয়ারা আল্লাহর কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারাতো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করনা; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (সুরা আন নূর : ১১)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

• আর যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন আযাব স্পর্শ করত। (সুরা আন নূর:১৪)

হযরত আয়েশা রা.

১. সমস্ত উম্মতের মা উম্মাহাতুল মুমিনীন দের মধ্যে সর্বোত্তম।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক মহব্বতের স্ত্রী এবং বিবিদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী।

৩. পুরো মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম সাথী ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মেয়ে।

এখন ভেবে দেখুন, আপনার মা, দুজাহানের সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মেয়ের ব্যাপারে যারা এরকম বলে,কুরআনকে যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, পুরো উম্মতের ‘মা’কে যিনাখোর যারা বলে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে কিভাবে মেনে নেন?

ইমাম ইবনু কাসির বলেন, ‘সেসব লোকের জন্য দুর্ভোগ, যাঁরা সাহাবিদের সবাইকে অথবা কোনো কোনো সাহাবিকে ঘৃণা করে কিংবা গালিগালাজ করে। বিশেষত নবীজির পর যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তথা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। রাফেজিরা সাহাবিদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। এটা তাদের অন্তরের বক্রতা ও বুদ্ধির বিকৃতি প্রমাণ করে। তারা মূলত কোরআনের প্রতিই বিশ্বাস রাখে না।’

তাঁদের মিথ্যাচারঃ

(ক) হযরত ওসমান (রাঃ) কে মদিনায় বিদ্রোহী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় রেখে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মক্কা শরীফে হজ্ব করতে চলে যান। হজ্ব সমাপন শেষে তিনি মদিনায় না এসে বসরার দিকে চলে যান। তাঁর সাথে ১৬ হাজার লোক-লস্কর ছিল। হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। অথচ কুরআনে এভাবে ঘুরাফেরা করা উম্মুল মুমিনীনদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সুরা আহযাবের ৩২ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো।"

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আপন ঘরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন- অথচ হযরত আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ)।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব হচ্ছে: উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য যদি সদা সর্বদা ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ হতো- তাহলে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রাসুলুল্লাহ (সা.)-) তাঁদেরকে নিয়ে হজ্ব, ওমরা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন কিভাবে? তাঁদের পিতা-মাতার বাড়ীতে পাঠালেন কি করে? আত্মীয়-স্বজনদের অসুখ-বিসুখে সেবা করার জন্য প্রেরণ করলেন কেন?

এতে বুঝা গেল-বিনা প্রয়োজনে ঘুরা-ফেরা করাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বৈধ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। শিয়ারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। আয়াতের মর্মার্থ হলো- "বিনা পর্দায় অলিগলিতে এবং বাজারে জাহিলিয়াত যুগের সাধারণ নারীদের মত তাঁরা যেন চলাফেরা না করেন"। শিয়াদেরই শ্রদ্ধেয়া জননী এবং মুসলিম নারীগণের ভূষণ।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে পর্দা সহকারে মদিনার তিন মাইল দূরে ওহোদ ময়দানে পায়ে হেঁটে গিয়ে হযরত আমির হামযার (দাদার ভাই) মাযার যেয়ারত করতেন। শিয়ারা এর কি জবাব দেবেন? তাদের কিতাবেও বিশ্বস্ত সূত্রে ফাতিমার (রা) এ ঘটনা বর্ণিত আছে। তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরূদ্ধে এই অভিযোগ কেন?

(খ) তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি হিংসাপরায়ণা ছিলেন। বিবি খাদিজার (রাঃ) নাম শুনলে তিনি জ্বলে উঠতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, " রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিগণের মধ্যে কোন বিবির প্রতি আমি এত ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না- যত ছিলাম বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি- অথচ আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাঁর কথাই বেশী স্মরণ করতেন"।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)- এর গায়রত বা ঈর্ষা প্রকাশ স্বয়ং রাসুল (সা)- এর সম্মুখে ছিল। যদি তা দোষণীয় হতো- তাহলে তিনিই মালামত করতেন। অথচ এর কোন প্রমাণ নেই। স্বামী হয়ে নবীজী (সা) নিজ স্ত্রীর কোন দোষ দেখলেন না- অথচ শিয়ারা নিজ মায়ের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে? তারা কেমন সন্তান- তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো- রাসুলুল্লাহ (সা.)-- খাদিজার (রাঃ) কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁদতেন। অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) মনে করতেন- হয়তো প্রিয় নবীজী (সা) তাঁকে বেশী ভালবাসেন না। স্বামীর অধিক ভালবাসা প্রাপ্তিই ছিল তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য। এটা নিন্দনীয় হতে পারে না। তদুপরি স্বপত্নীদের প্রতি ঈর্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.)-- অন্যান্য স্ত্রীদের চাইতে হযরত আয়েশাকে বেশী ভালবাসতেন। তিনি বলতেন- "হে আল্লাহ! আমি এ ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম"। শরীয়তে অন্যান্য হকের ও অধিকারের বেলায় সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ভালবাসা বা মনের আকর্ষণের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(গ) শিয়াদের তৃতীয় অপবাদ হলোঃ " আয়েশা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরে অনুশোচনা করে নিজেই বলেছেন- "হায়! আমি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম- তাহলে কতই না ভাল হতো।" এতে বুঝা যায়- "তিনি অন্যায় করেছেন" (নাউযুবিল্লাহ)।

শিয়াদের এই অপবাদের প্রথম জবাবঃ হযরত আলীও তো উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের শহীদগণকে দেখে আফসোস করে বলেছিলেন- "হায়। আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম। তাহলে কতই না ভাল হতো"- শিয়াগণ এর কি জবাব দেবেন? এরূপ বলা দোষের হলে উভয়কেই দোষী বলতে হবে। পারবে কি ওরা তা বলতে?

প্রকৃত জবাব হলো: কোন দূর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করা এবং নিজের কার্যাবলীর জন্য অনুশোচনা করা ঐ কাজের অবৈধতার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আলী (রাঃ) ও উম্মুল মুমীনিন আয়েশা (রাঃ) উভয়েই যুদ্ধের অহেতুক ক্ষয়ক্ষতির জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। নিজেদের অপরাধ বা ভুলের জন্য নয়। বাতিল বলতে হলে উভয়কেই বলতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)।

'আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে আমার সাহাবিদের কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়; যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়; যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৬৮০৩)

উপসংহার

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে গড়া একটি দল। তাঁরা কোরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝেছে। সুতরাং দ্বিনের ব্যাপারে তাঁরাই উম্মতের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। আবু বুরদাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন।

যার শেষাংশে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আকাশের দিকে মাথা তুললেন এবং তিনি বেশির ভাগ সময়ই আকাশের দিকে তাঁর মাথা তুলতেন। অতঃপর তিনি বললেন, তারকারাজি অবস্থানের কারণেই আকাশ স্থিতিশীল আছে। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে তখন আকাশের জন্য ওয়াদাকৃত বিপদ আসন্ন হবে (কিয়ামত এসে যাবে)। আর আমি আমার সাহাবাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাস্বরূপ।

আমি যখন বিদায় নেব, তখন আমার সাহাবিদের ওপর ওয়াদাকৃত সময় এসে সমুপস্থিত হয়ে যাবে (ফিতনা শুরু হবে)। আর আমার সাহাবিরা সব উন্মতের জন্য রক্ষাকবচস্বরূপ। আমার সাহাবিরা যখন বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উন্মতের ওপর ওয়াদাকৃত বিষয় উপস্থিত হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৩৬০)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পদ্ধতি নিম্নোক্ত এ মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ‘সর্বোত্তম ইলম তা হলো যা সাহাবীগণের ইলম অনুসরণ করে অর্জিত হয়েছে, আর সর্বোত্তম আমল হলো তা যা সাহাবীগণের আমল অনুসরণ করে করা হয়েছে। তারা মনে করেন, সাহাবীগণ সব ফযীলত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সবার উপরে।’[শরহুল আক্বীদাতিল আসফহানিয়্যাহ, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৮]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে আল্লাহর ওয়াস্তে ও আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই ভালোবাসেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, যারা তাদেরকে ভালোবাসবেন, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন ও তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হবেন তারাই সফলকামী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যারা তাদেরকে অপছন্দ করবেন, তাদেরকে গাল-মন্দ করবেন, শত্রুদের দলে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন ও তাদের মর্যাদার বিপরীত কিছু বলবেন তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

উম্মতের মধ্যে সম্মান-মর্যাদা, সততা ও বিশুদ্ধতায় সাহাবীগণের মতো আর কেউ নেই। [আদ-দুররাতুল মুদিয়্যাহ ফি ‘আক্বীদাতিল ফিরকাতিল মারদিয়্যাহ মা‘আ শারহিহা লাওয়ামি‘উল আনওয়ার, ২/৩৭৭]

এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে অকাট্য ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এ মতের সাথে কিছু বিদ‘আতীদের একমত না হওয়া ধর্তব্য হবে না।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার ‘নুনিয়্যাহ’ কিতাবে বলেছেন, ‘যেহেতু আলেমগণ ঐকমত্য যে, সাহাবীগণ (নবীদের পরে) মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম মানব। এটি অকাট্য ভাবে প্রমাণিত, এতে কারো কোনো মতানৈক্য নেই।’[নুনিয়্যাতু ইবনুল কাইয়্যিম মা‘আ শারহিহা তাওদীহুল মাকাসিদ, লি ইবন ‘ঈসা, ২/৪৬১]

সাহাবীগণের মর্যাদার ব্যাপারে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন তাদের মহিমান্বিত প্রশংসা বর্ণনায় ভরপুর। যেহেতু আল্লাহ তাদের সততা, বিশুদ্ধ ঈমান, প্রকৃত ভালোবাসা, পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপক্ক মতামত, পূর্ণাঙ্গ উপদেশ ও স্পষ্ট আমানত সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

কবি বলেছেন,

‘দীনের ব্যাপারে তাদের (সাহাবীগণের) অনুসরণ করা ফরয (অত্যাবশ্যকীয়), অতএব, তাদের অনুসরণ করো, আর অনুসরণ করো কুরআনের আয়াত ও সূরার।’ {দীওয়ানে ইবন মুশাররফ, পৃষ্ঠা ২৩}

পরিশেষে বলব, উপরোক্ত অধিকার হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর সম্মানিত সাহাবীগণের অধিকার। এ অধিকারের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত একমত ও এগুলো তাদের সর্বসম্মত আক্বীদা।

واذكر بخير، ترض، وقل عادي عدوهمُ
أحبب، عدالة، والتفضيل بينهم
فيما جرى، ومساوٍ واقتدي بهمو
واشهد لهم بجنانٍ لا تخض أبدا

ভালোবাসো, ন্যায়পরায়ণ বলো, সম্মানের স্তর মানো, উত্তমভাবে স্মরণ করো, রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম বলো, তাদের শত্রুদের শত্রু বলো, তাদের ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দাও, তাদের মধ্যকার বিবাদের ব্যাপারে গবেষণায় নিমজ্জিত হয়ো না, তারা সকলেই সমভাবে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানো, আর তাদেরকে যথাযথ অনুসরণ করে চলো। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহর সালাত, সালাম ও বরকত তার বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবী ও তাঁকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারীদের ওপর বর্ষিত হোক।

বিহুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

তথ্যসূত্র

পাঠ্যপুঞ্জিকা

[**} আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[**] হায়াতে সাহাবা

[**] আসহাবে রাসুলের জীবন কথা

[**] সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন ১,২

[**] উসওয়ায়ে সাহাবা ১,২

[**] আল-ফিকহুল আকবর , ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)]

[**] সহিহ বুখারী

[**] সহিহ মুসলিম

[**] নবীজীর সোহবতে ধন্য যারা ১, ২ , ৩

[**]   হায়াতুস সাহাবা

[**] উসদুল গাবাহ

[**] সিরাতে ইবনে হিশাম ১,২

[**]মুখতাসারুস সীরাহ

[**] ইসলামী আকীদা- সিলেবাস বই (Islamic Online Madrasah - IOM)

[**] নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

[**] কিশোর সাহাবী সিরিজ